প্রেসক্রিপশন বইটি সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মন্তব্য—

'আধি-ব্যাধির বলিষ্ঠতর মোকাবেলার জন্যে মনকে তৈরী করার ক্ষেত্রে প্রেসক্রিপশন অতুলনীয় ভূমিকা পালন করবে এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। ...অধ্যাপক ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে ব্যক্তিরোগীর সেবা কিংবা রোগবিশেষের চিকিৎসা করে সুনাম অর্জন করেছেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে তাঁর 'প্রেসক্রিপশন' ছিলো আশা ও আশ্বাসের প্রতীক। আলোচ্য 'প্রেসক্রিপশন'টিও তাই। তবে ব্যক্তি এক্ষেত্রে সমষ্টিতে পরিণত হয়েছে। এ প্রেসক্রিপশন সমগ্র জাতির উদ্দেশ্যে প্রণীত। রোগবিশেষে তাঁর প্রেসক্রিপশন যেমন অমোঘ গণ্য হয়ে এসেছে, জাতীয় ধ্যান-ধারণার [চিকিৎসা সংক্রান্ত] গলদ নিরসনেও একইভাবে ফলপ্রসূ হোক তাঁর নতুন 'প্রেসক্রিপশন'।

বইটি প্রতিটি ঘরে ঠাঁই পাওয়ার দাবী রাখে।'

দৈনিক বাংলা
২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪

'এক কথায় চিকিৎসা জগতে বর্তমান জটিলতা কিংবা ব্যাধি থেকে রেহাই পেতে হলে অধ্যাপক নুরুল ইসলামের 'প্রেসক্রিপশন' একটা সুযোগ্য প্রেসক্রিপশন বা ব্যবস্থাপত্র।'

সচিত্র বাংলাদেশ
১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫

'মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য, সুখ নিয়ে জঘন্য যে পাপ-ব্যবসা চলছে তার হুবহু চিত্র তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা পেশার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের ওপর এক হাত নেবার সাহসী প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেল ওপার বাংলার যশস্বী চিকিৎসক নুরুল ইসলামের লেখা প্রেসক্রিপশন বইটিতে...অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকারক ওষুধ সম্পর্কে সর্বপ্রথম দেশের চিকিৎসক সমাজকে সচেতন এবং দায়িত্বশীল করে তুলতে সাহসী অধ্যাপক নুরুল ইসলামের সৎ চেষ্টার তুলনা নেই।'

সাপ্তাহিক দেশ

১১ আগস্ট ১৯৮৪, কোলকাতা

'আকর্ষণীয় রচনাবলী পড়তে হ্যানরিক ইবনেস রচিত নাটকের ডাক্তারের কথা মনে পড়ল। তাকে গ্রন্থকারের সাথে তুলনা করা চলে। এখানে চিকিৎসক অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে পরাজিত হন। আমি অধ্যাপক ইসলামের সফলতা কামনা করি কারণ এটা অনস্বীকার্য যে বইটি লিখে তিনি একটি বিরাট জাতীয় দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রত্যেকের জন্যে এটা অবশ্য পাঠ্য হওয়া উচিত।'

বাংলাদেশ টাইমস্

২১ জানুয়ারি ১৯৮৪

প্রেসক্রিপশন

অধ্যাপক নুরুল ইসলাম

এম. বি. (কলি.), টি.ডি.ডি. (ওয়েলস), এফ. সি.সি.পি. (আমেরিকা), এফ. সি. পি. এস. (পাক), এফ. আর. সি. পি. (লণ্ডন), এফ. আর. সি. পি. (এডিন)

বাউলমন প্রকাশন

২৮, বালিগঞ্জ গার্ডেন্স

কলিকাতা-৭০০০১৯

রোগের বিরুদ্ধে যাদের সংগ্রাম
রুগীর সেবায় যারা নিবেদিত
—তাদের উদ্দেশ্যে

যাঁরা সাহায্য করেছেন, উৎসাহ যুগিয়েছেন

পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখায়

আনোয়ারা ইসলাম, ডঃ সিরাজুল করিম, ডাঃ আবদুল ওয়াদুদ, ডাঃ নাসিমা আক্তার চৌধুরী, মিজানুর রহমান

পুস্তক প্রকাশের চিন্তাধারায়

আনোয়ারা ইসলাম, ডঃ সিরাজুল করিম, ডাঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরী, ডাঃ আজিজুর রহমান

বিক্ষিপ্ত পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ও সংরক্ষণে

নীনা, ইফতেখার, দীনা

তথ্য সংগ্রহে

ডাঃ নূরুল আনোয়ার, কাওসার আরা, আবু সাঈদ, ডাঃ আবদুল হোসাইন খান চৌধুরী

পূর্ব প্রকাশিত প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণে যাঁরা অনুমতি দিয়েছেন

সম্পাদকবৃন্দ : দৈনিক বাংলা, ইত্তেফাক, বাংলাদেশ টাইমস, গণকণ্ঠ, বাংলার বাণী, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, সচিত্র স্বদেশ, মেডিকেল ডাইজেস্ট

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

রোগের চিকিৎসায় ওষুধ ব্যবসায়ী, রুগী এবং চিকিৎসক এই তিন গোষ্ঠী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। ব্যবসায়ীদের দায়িত্ব এমন ওষুধ তৈরী করা যা অপ্রয়োজনীয় বা ক্ষতিকর নয়। প্রচারপত্র এমন হতে হবে যাতে উপকারিতা সম্বন্ধে অহেতুক দাবী থাকবে না, অপকারিতা কিংবা পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া গোপন করা হবে না। মোট কথা সহজ সরল-ভাষায় জনসাধারণ যাতে বুঝতে পারে এমন করে বিভিন্ন উপায়ে যথা: লেখা, কার্টুন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করতে হবে। ওষুধনীতিতে যে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে তা মেনে চলতে হবে। এতে জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা পাবে, ওষুধ প্রস্তুতকারকদের স্বার্থে কোন আঘাত আসবে না। জনবহুল বাংলাদেশে ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ওষুধ কোম্পানীগুলো ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে, এই ধারণা অবাস্তব।

অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ১৫০ টি ওষুধ কয়েকটি জটিল রোগ ছাড়া প্রায় সব রোগের জন্য যথেষ্ট। ওষুধনীতির ফলে কোন রুগী বিশেষ কোন ওষুধের অভাবে মারা যেতে পারে বলে কেউ যদি দাবী করে, সেটা সত্য নয়। ১৫০ টি ওষুধ ছাড়াও অতিরিক্ত ১০০ টি ওষুধ নির্দিষ্ট করা হয়েছে যেগুলো বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ কর্তৃক ক্যান্সারের মত অনেক জটিল কিংবা বিশেষ রোগে ব্যবহৃত হবে। তাহলে দেখা গেল আইনের আওতায় ২৫০ টি ওষুধ বাংলাদেশে চালু থাকবে। বহুজাতিক আলোচনার ভিত্তিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ওষুধের তালিকায় মোট ২৫০ টি ওষুধ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্র দেশ বাংলাদেশ। এদেশের অধিকাংশ রুগী চাহিদা অনুসারে খাবার পায় না। তার ওপর ওষুধের খরচের বোঝা এদের দৈনন্দিন জীবনে একটা আঘাত। বাঁচার তাগিদে ওষুধ যেখানে অপরিহার্য, তা তাদের পেতে হবে। তবে দেখতে হবে এই ওষুধের পেছনে সামান্য আয়ের সবটুকু ব্যয় করে অনাহারে তারা যেন মারা না যায়। তাদের সামর্থ বিবেচনা করে সঙ্গতিপূর্ণ উপযুক্ত ওষুধ ব্যবহারের সুব্যবস্থা করতে হবে। কি ধরনের প্রেসক্রিপশন তাদের দিতে হবে, সেটাই এখানে বিচার্য। সামান্য সর্দির জ্বরে সস্তা এসপিরিন না দিয়ে ব্যয়বহুল এ্যান্টিবায়োটিক প্রদান করা ন্যায়নীতি-বহির্ভূত; এবং তা বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা বা প্রেসক্রিপশন নয়। এখানেই চিকিৎসকের দায়িত্ব। যেহেতু বাংলাদেশের দরিদ্র জনগণ বিভিন্ন পর্যায়ের চিকিৎসকের উপর নির্ভরশীল, এবং চিকিৎসক বলতে অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত গ্রামীণ ডাক্তার থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত

চিকিৎসক সবাইকে বুঝায়, আর শতকরা ৮০ ভাগ লোক শিক্ষিত চিকিৎসকের নাগাল পায় না, সেখানে এমন একটা ব্যবস্থা করতে হবে যাতে জনসাধারণ এবং যাদের উপর তারা চিকিৎসার জন্য নির্ভরশীল, তাঁরা যেন বিভিন্ন উপায়ে বিভ্রান্ত না হয়। কোম্পানীগুলোর প্রচার মাধ্যম যেমন : প্রচারপত্র, বা তাদের প্রতিনিধি সুপ্রতিষ্ঠিত নীতিমালা অনুসরণ করে এদেরকে সঠিকভাবে পরিচালিত করবে। সুপ্রতিষ্ঠিত উচ্চশিক্ষিত চিকিৎসকের দায়িত্ব এখানে নগণ্য নয় বরং অপরিসীম। তাঁরা যা লেখেন, তাঁরা যা করেন, আর সবাই তা অনুকরণ বা অনুসরণ করে। তাঁদের সঠিক নির্দেশ শুধু রুগী নয় গোটা চিকিৎসক গোষ্ঠীকে ঠিক পথে চলতে প্রভাবিত করে। অন্য দিকে তাঁদের ভুলের মাশুল গ্রহণ করতে হয় অগণিত ব্যাধিগ্রস্ত জনসাধারণকে।

বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে এই সংকলনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় রচিত হয়েছে। এছাড়া আরো কিছু নতুন লেখাও সংযোজিত হয়েছে। অত্যন্ত খোলা মন নিয়ে অভিজ্ঞতার আলোকে চিকিৎসা ক্ষেত্রে দেশের পরিস্থিতি বিবেচনা করেই অধিকাংশ লেখা ।

বাংলাদেশের ওষুধনীতি দেশ-বিদেশে এখন স্বীকৃত এবং অভিনন্দিত। কেন এই ওষুধনীতি—তার সম্যক উপলব্ধি করা যাবে বিভিন্ন প্রবন্ধ থেকে। ওষুধনীতির নীতিমালা, কিছুসংখ্যক ওষুধের বর্ণনা, ক্ষতিকর ওষুধের তালিকা, সকলের উপকারে আসবে এই বিশ্বাসে সংযোজিত হয়েছে।

বহুজাতিক কোম্পানীর প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞগণ এবং নিরপেক্ষ সাংবাদিকমহল তার প্রত্যুত্তরে কি বলেছেন বা প্রকাশ করেছেন, সকলের গোচরে আনার প্রয়াসে কিছুটা সন্নিবেশিত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অভিনন্দনবাণী এবং প্রতিক্রিয়া প্রকাশ ছোটখাট একটা গ্রন্থে পরিণত হবে বিধায় মাত্র কয়েকটা বাছাই করে নেয়া হয়েছে।

কোন পেশাকে হেয় করা কিংবা কাউকে ছোট করে দেখা আমার উদ্দেশ্য নয়। যে ব্যবস্থার মাধ্যমে চিকিৎসক সমাজ নিজেদের দায়িত্ব পালনে বাধার সম্মুখীন হবেন না, দুঃস্থ দরিদ্র জনগণ অযথা অপ্রয়োজনীয় ওষুধের পিছনে সীমিত সম্পদের অপচয় করবেন না, ব্যবসায়ীমহল মুনাফার লোভে জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবেন না—এই সংকলন এমন একটি প্রেসক্রিপশন।

গুলমেহের
১৬ ডিসেম্বর, ১৯৮৩

নুরুল ইসলাম

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বর্ষপূর্তি হতে না হতেই প্রেসক্রিপশনের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা লেখার সুযোগ হবে ভাবিনি। পাঠক সমাজে এর আশাতীত সমাদর, স্বদেশ এবং পার্শ্ববর্তী দেশের প্রশংসামূলক সমালোচনা আমাকে উৎসাহিত করেছে। ইত্যবসরে স্বাস্থ্য বিষয়ক আমার কয়েকটি প্রবন্ধ বিভিন্ন সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোর তিনটি প্রেসক্রিপশনে অন্তর্ভুক্তির উপযোগী বলে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন।

এভাবে পাঠক, সমালোচক এবং বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে পরামর্শ এবং উৎসাহ পেয়ে প্রেসক্রিপশনের বর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে এগিয়ে আসি। 'ভোজনে ওজন,' 'যে দুটো ক্যান্সার প্রতিরোধ সম্ভব' এবং 'খাবারে কুসংস্কার' এ তিনটি প্রবন্ধ সংযোজনের সুযোগ নিই। ফলে বইটির যাতে কলেবর বৃদ্ধি না হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখে গ্রন্থকার এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে প্রেরিত চিঠিপত্র ছোট অক্ষরে দুই কলামে ছাপানো হয়েছে। অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকায় অনুরূপ ছোট অক্ষরে নূতন দেশী ওষুধের নাম সংযোজিত হয়েছে। এতে বিষয়বস্তুর কোন অংশ বাদ না দিয়েও বইটির আয়তন মোটামুটিভাবে আগের মত রাখা সম্ভব হয়েছে।

ওষুধ নীতি এখন সর্বজন স্বীকৃত, দেশ-বিদেশে সমাদৃত। অহেতুক ভয় এবং সমালোচনা বহুলাংশে এখন উৎসাহ এবং প্রশংসায় রূপান্তরিত। অপ্রয়োজনীয় ক্ষতিকর এবং অযথা ব্যয়বহুল ওষুধ সম্বন্ধে এখন অনেকে ওয়াকিবহাল। তবুও আমাদের সজাগ থাকতে হবে। স্বার্থান্বেষী মহল তাদের স্বার্থের খাতিরে জনস্বার্থকে যে কোন সময় বিসর্জন দিতে পারে। সত্য এবং ন্যায় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছনর পথে বাধার সৃষ্টি করতে পারে। সে যাত্রা পথে প্রেসক্রিপশন কিছু অবদান রাখতে পারলে মনে করব আমার এ প্রচেষ্টা সফল হয়েছে।

প্রেসক্রিপশনের দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমি আজ আনন্দিত।

"গুলমেহের" নুরুল ইসলাম
ঢাকা
১ বৈশাখ, ১৩৯২
১৪ এপ্রিল, ১৯৮৫

এপার বাংলা সংস্করণের ভূমিকা

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক নূরুল ইসলামের পরম প্রয়োজনীয় বইটি আমরা এ বাংলায় মুদ্রিত করলাম। এতে সামান্য কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে।

(১) 'পাণি' শব্দটির পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে 'জল' শব্দটি। পাণি এবং জল উভয়ই সংস্কৃত শব্দ। পাণি শব্দটি উত্তর ভারতে বহুল প্রচারিত ছিল। আর দাক্ষিণাত্যে 'জলম্'। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে সেন রাজারা দক্ষিণ ভারত থেকে আসবার সময় উত্তর ভারতে জল শব্দটি আনেন আর রাজার ভাষা বলেই জল শব্দটি উত্তরে প্রচারিত হয়। পশ্চিমবাংলায় যেহেতু জল কথাটিই সাধারণ মানুষ ব্যবহার করেন তাই তাঁদের সুবিধার্থে এই পরিবর্তন, কোনও বিশেষ শব্দের প্রতি পক্ষপাতিত্বে নয়।

(২) এই একই কারণে ডাক্তার সাহেবকে ডাক্তারবাবু, ইছবগুলকে ঈশবগুল এবং ওয়াকেফ্‌হালকে ওয়াকিবহাল করা হয়েছে। 'সেচ্চার' শব্দটি সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ আপত্তি আছে। এই শব্দটি সংবাদপত্রের মাধ্যমে এখন প্রচারিত এবং মুখর অর্থে ব্যবহার হচ্ছে। সোচ্চার শব্দটির অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন, মুখর শব্দের সঙ্গে কোনও যোগ নেই—তাই এ শব্দটি আমরা বাদ দিলাম।

মূল বইটির শেষাংশে সংযোজিত ছিল "গ্রন্থকারের সাথে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সাক্ষাৎকার", পৃথিবীর জ্ঞানীগুণীদের প্রশংসাপত্র। মূলোচ্ছাস করবার জন্য এগুলো থেকে শুধুমাত্র মেডিকেল ডাইজেস্ট পত্রিকার 'স্বাস্থ্য না ধূমপান—এর কোনটি চান' গ্রহণ করে অন্যান্যগুলিকে এ সংস্করণে স্থান দেওয়া গেলো না। এ বইয়ের বিভিন্ন উপাত্তগুলি (datum) বাংলাদেশের পক্ষে প্রযোজ্য হলেও আমাদের দেশের অবস্থা মূলত একই। এ দেশের সব পরিসংখ্যান আমরা সঠিকভাবে জানার চেষ্টা করছি 'বাউলমন'-এর মাধ্যমে। সেগুলি সময়মত পৌঁছে দেবার আশা রাখি।

বাংলাদেশের ওষুধ নীতি অনুযায়ী যে সব ওষুধ পরিত্যাজ্য হয়েছে আমাদের দেশে তার অনেকগুলোই প্রচলিত আছে।

এ বইটি চিকিৎসক সমাজ এবং সাধারণ মানুষ সকলের জন্য—নিজেকে জানার, শরীরকে চেনার এবং নিজের শরীর যাতে স্বার্থান্বেষীদের শিকার না হয় তার জন্য সচেতন হওয়ার এ বই। আমরা যারা না জেনে বা প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে তলিয়ে না দেখেই রোগীকে ব্যবস্থাপত্র দিই—অনিচ্ছাকৃতভাবে অজ্ঞানতার ফলে রোগীর ক্ষতির কারণ হই তাদের চক্ষুরুন্মীলন করতে এ বইটি একটি বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা।

শর্মিষ্ঠা রায়

সূচীপত্র

"বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী ওষুধ নীতি বিশ্বে সর্বপ্রথম বাংলাদেশে তৈরি করা হয়। এতে অবশ্য বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর মুনাফাপ্রবণতা দারুণ চোট খায় এবং তারা প্রয়োজনীয় ওষুধ বানাতে বাধ্য হয়।"

"ওষুধ নীতির প্রেক্ষাপট, চিকিৎসক জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে অধ্যাপক ইসলাম 'প্রেসক্রিপশন' নামে একটি বই লিখেছেন। প্রকাশকাল ১৯৮৪। আলোড়ন তুলেছে পাঠক মহলে। প্রথম সংস্করণ শেষ।"

"...বইটিতে ঘুরে ফিরে যে কথাটা খোলসা করা হয়েছে, তা হল-সব অসুখে ওষুধ লাগে না। অনেকগুলো ওষুধ একসাথে দিলে অনেক উপকার হবে, এসব অযৌক্তিক মিথ্যা ধারণার বশে আমরা আর কতদিন নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ রাখবো? নিতান্ত অসহায় অনেকাংশ নিরুপায় রোগীদের সমস্যাজর্জরিত না করে, সংকটমুক্ত করে এটাকে নীতিগত এবং জাতীয় অনুভূতির মাধ্যমে বিচার করতে হবে।"

দৈনিক আজকাল

৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫, কোলকাতা

চিকিৎসা যেখানে সংকট

বাংলাদেশে নয় কোটি লোকের বাস। আর পাশ করা ডাক্তার আছেন সাকুল্যে বার হাজার। অর্থাৎ সাড়ে সাত হাজার লোকের জন্য মাত্র একজন ডাক্তার। দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮৫ ভাগের বসবাস গ্রামাঞ্চলে। কিন্তু পাশ করা ডাক্তারদের শতকরা ৯০ ভাগই বিভিন্ন ব্যক্তিগত, সামাজিক ও আর্থিক কারণে বসবাস করেন শহরে। প্রতি সাড়ে সাত হাজারের জন্য হিসাবমতে একজন ডাক্তার হলেও আসলে গ্রামাঞ্চলের প্রতি অর্ধ লক্ষেরও বেশী লোকের জন্য আছেন মাত্র একজন ডাক্তার। আর শহরে এই সংখ্যা দাঁড়ায় প্রতি দেড় হাজারে একজন।

গ্রাম এবং শহরে লোকসংখ্যা ও ডাক্তারের অনুপাতে আকাশ পাতাল তফাৎ থাকলেও উন্নত দেশের তুলনায় এবং চাহিদা অনুসারে এদেশে ডাক্তারের সংখ্যা নগণ্য। অনেকে গর্ব করে বলে থাকেন, বিগত কয়েক বছরে মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ৭টি থেকে ১১টিতে উন্নীত হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে মাত্র ৮টি কলেজে ক্লিনিক্যাল বিভাগ আছে। ঢাকায় আছে ২টি। এছাড়া বিশেষ ধরণের ইন্সটিটিউট রয়েছে যেমন পি. জি. বক্ষব্যাধি, হৃদরোগ, পঙ্গু চিকিৎসা ইত্যাদি—এগুলোর সবই রাজধানী ঢাকায়। চিকিৎসক এবং চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধার অসম বন্টন এই ব্যবধানকে আরও প্রকট করে তুলেছে। এই কারণে গ্রাম বাংলার জনগণ ও শহরাঞ্চলীয় লোকদের রাজধানীর বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। আবার এসব চিকিৎসকদের অনেকেরই ন্যূনতম যোগ্যতাও নেই।

কলেজ এবং ইন্‌ষ্টিটিউটগুলোর সংখ্যা নগণ্য না হলেও এগুলো শিক্ষা এবং পেশাগত যোগ্যতার মান নিরূপণে কতটুকু অবদান রাখছে, তা ভেবে দেখার মত। এই দুঃখজনক পরিস্থিতির কারণ অনেক। সুনির্দিষ্ট নীতিমালা বহির্ভূত নিয়োগ, পদোন্নতি এবং বদলি এর অন্যতম। তাছাড়া শিক্ষক এবং এ পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের মাঝে মাঝে পেশাগত যোগ্যতার মান নির্ণয়ের কোন ব্যবস্থা নেই। যদিও অনেক উন্নয়নশীল দেশে বহুকাল থেকে এটা প্রচলিত আছে। শিক্ষার্থীদের ব্যালটের মাধ্যমে শিক্ষক যাচাই অনেক দেশে চালু আছে। সন্দেহাতীতভাবে এটা শিক্ষকের মান বাড়ায়। এ ধরণের একটা ব্যবস্থা না থাকা বাংলাদেশের জন্য বিরাট এক প্রশাসনিক দুর্বলতা। ফলে অনেক অযোগ্য, এমনকি অপদার্থ ব্যক্তি বিভিন্ন কলাকৌশলে শিক্ষাঙ্গনে এমন স্থান দখল করে আছে যা জাতির জন্য দুঃখজনক এবং শিক্ষার্থী তথা রুগ্ন জনগণের জন্য বিপজ্জনক। ফলে অসহায় ছাত্ররা যেমন তাদের হাতে বিপথগামী হয়, তেমনি রোগীরাও উপশমের স্থলে সংকটের সম্মুখীন হয়। এই নিবন্ধে চিকিৎসা কিভাবে সংকটে পরিণত হতে পারে, তাই আলোচিত হয়েছে।

রোগের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত অথচ পরীক্ষা-নিরীক্ষা অসংখ্য

প্রত্যেক চিকিৎসকের একান্ত কর্তব্য হচ্ছে অন্তত কিছুটা সময় নিয়ে মনযোগ দিয়ে রোগের ইতিহাস জানা। অথচ তাড়াহুড়ো করে রোগীকে বিদায় দিতে গিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাদ পড়ে যায়। তার পরিণতি হিসাবে অনেক ব্যয়বহুল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এবং উপদেশ দেওয়া বর্তমানে চিকিৎসকদের কারও কারও নিয়মিত ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। এতে একজন অসহায় রুগীর কিভাবে শারীরিক এবং আর্থিক ক্ষতি হতে পারে, তার দু-একটি উদাহরণ এখানে তুলে ধরবো।

সেদিন এক তরুণী পেটের উপরিভাগে সামান্য অস্বস্তি, বুক জ্বালা এবং ঘন ঘন প্রস্রাব—এ-ক'টি উপসর্গ নিয়ে ডাক্তারের কাছে আসেন। এ কথা ক'টি শোনামাত্রই তাড়াহুড়ো করে রোগীকে পরীক্ষা করে তিনি রক্ত, মল, মূত্র পরীক্ষা করতে উপদেশ দিলেন। বলা বাহুল্য এই তিনটি জিনিস পরীক্ষা করা এখন ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। আরও উপদেশ দিলেন ইন্ট্রাভেনাস পায়লোগ্রাফী (এক রকমের ওষুধ ইন্‌জেকশন দিয়ে মূত্রকোষ এবং মূত্রাশয়ের পরীক্ষা করা) এবং বেরিয়াম খেয়ে পাকস্থলী পরীক্ষা করার জন্য। এই দু-ধরণের এক্সরে করানোর উদ্দেশ্য, ডাক্তারবাবু ধরে নিয়েছেন, এই রুগীর লক্ষণগুলো আলসার কিংবা মূত্রকোষের পাথরের জন্য হতে পারে। উক্ত দু রকমের এক্সরে করার পর একটা না একটা ধরা পড়বেই। এ-সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ করতে প্রায় এক সপ্তাহ সময় লেগেছে। সব রিপোর্টগুলো নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাবার সময় তার স্বামীও সাথে গেলেন। তিনি উচ্চ শিক্ষিত যুবক। ছ'মাস আগে তাদের বিয়ে হয়েছে। ডাক্তারবাবু দেখতে পেলেন এক্সরে এবং অন্যান্য রিপোর্টে কিছুই ধরা পড়েনি। চিন্তিত ডাক্তারকে স্বামী জানালেন বিগত তিন মাস ধরে তার স্ত্রীর মাসিক বন্ধ। সাথে-সাথেই বলা হল মূত্র পরীক্ষা করতে এবং একজন গাইনোকোলজিস্ট দেখাতে। এই দুই সূত্র থেকে প্রমাণিত হল যে তরুণী অন্তঃস্বত্তা। ডাক্তারবাবু বলতে বাধ্য হলেন, তার লক্ষণগুলো এ-কারণেই।

গর্ভাবস্থায় এই ধরনের লক্ষণ হতে পারে এটা নিশ্চয় ডাক্তার সাহেবের অজানা নয়। কিন্তু ছ'মাস আগের বিবাহিতা তরুণী তিন মাসের গর্ভধারণের এইসব লক্ষণ নিয়ে আসতে পারে, এই চিন্তা ভাবনা করা কিংবা তার রোগের সম্পূর্ণ ইতিহাস নিতে গিয়ে তার মাসিক সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার সময় তার কোথায়। তারই পরিণতি হিসাবে অসহায় রোগীর শারীরিক ক্ষতি হয়েছে প্রচুর। ল্যাবরেটরি এবং এক্সরে ক্লিনিকে শুধু ছোটাছুটি নয়, গ্লাশভর্তি বেরিয়াম খাওয়া, সিরিঞ্জ ভর্তি ইনজেকশন এগুলো নিশ্চয়ই তার কাছে আরামদায়ক ছিল না। অন্যদিকে এগুলোর ব্যয়ভারও কম নয়। আজকের দিনে অনেকের এক মাসের বেতনের সমান।

ধরা যাক, তার ইন্ট্রাভেনাস পায়লোগ্রাফী স্বাভাবিক দেখে পেপটিক আলসার বলেও যদি একটা ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হত, তাহলে তিন-চার সপ্তাহ পরে স্ফীত তলদেশ দেখে তার গর্ভধারণ ধরা পড়ত এবং এরপর নিশ্চয়ই তিনি তা ডাক্তারকে জানাতেন। ডাক্তার

তার ভুল বুঝতে পেরে চিকিৎসার ধারা বদলে দিতেন এবং কিছু ভিটামিন, আয়রণ (গর্ভধারণের সময়কার স্বাভাবিক প্রেসক্রিপশন) খেতে উপদেশ দিতেন।

গর্ভধারণের প্রথম তিনমাসে এক্সরে করা ভ্রূণের জন্য বিপজ্জনক এবং বিভিন্ন ধরনের অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি করতে পারে। এসব ক্ষেত্রে এটা অনস্বীকার্য যে শারীরিক যন্ত্রণা ও আর্থিক কষ্ট অনায়াসে পরিহার করা যেত যদি শুরুতেই তার উপসর্গগুলোর বিবরণ মনযোগ ও যত্নের সাথে শোনা যেত। প্রাকটিসে নিমগ্ন ডাক্তারের অতি ব্যস্ততা কিংবা উদাসীনতা থেকে জন্ম নেয়া এই 'অকাজের পরীক্ষা' অনেকগুলো উদাহরণের একটি।

অজ্ঞতা ও অযৌক্তিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চিকিৎসকের অজ্ঞতার জন্য রুগীকে করতে হয়। রেমিটেনট জ্বর নিয়ে চতুর্থ দিনে জনৈক রুগী ডাক্তারের কাছে এলেন। উপসর্গ শুনে টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া এবং কালা জ্বর তিনটিই তার সন্দেহ হল। তিনি টাইফয়েডের জন্য ব্লাড কালচার ও ভিডাল এবং কালা জ্বরের জন্য এ. টি., সি. টি., সি. এফ. টি. পরীক্ষা করতে বললেন। কিন্তু চার দিনের জ্বরে এই সব রোগের জন্য এই পরীক্ষাগুলো খুবই অযৌক্তিক। কারণ ঐ সব রোগ এত অল্প সময়ের উপসর্গে ঐ সব পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয় না। আরও সময় লাগে।

কাজেই এ-ক্ষেত্রে টাইফয়েড বা কালা জ্বর হয়ে থাকলেও এ-সব পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ হবে না। ম্যালেরিয়ার জন্য একটি ব্লাড স্লাইডের সতর্ক পরীক্ষাই যথেষ্ট। কালা জ্বরের জন্য এ সমস্ত পরীক্ষা এই পর্যায়ে নেগেটিভ হবে জানা সত্ত্বেও এগুলো পরীক্ষার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এ-সব পরীক্ষা করতে বলার অর্থ হচ্ছে রোগের সাথে সময়ের যে সম্বন্ধ, তা না জানার ফল। কোন্ সময়ে কোন্ রোগের কি পরীক্ষা দরকার, সেটা দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর জানা নেই। নেগেটিভ রিপোর্টের কারণে রুগী বেচারীর খামাকা অর্থদণ্ড হয়, যার হয়ত এ রকম বিলাসিতা করার মত সঙ্গতি নেই। অন্যদিকে এই রিপোর্ট ডাক্তারকে বিপথে চালিত করে। অসময়ের পরীক্ষার ফল বা রিপোর্ট নেগেটিভ হওয়ায় তিনি রুগীর অন্য কোন রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা নিয়ে হয়ত ভাবতে পারেন। উপরোক্ত ধরনের পরীক্ষা-সংকটের জন্য ডাক্তারদের পাশাপাশি ল্যাবরেটরীর লোকজনও কোন অংশে কম দায়ী নয়। টেকনিক্যাল জ্ঞানহীন ব্যবসায়ীদের ল্যাবরেটরী ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠেছে। সম্প্রতি এই ধরনের ল্যাবরেটরীগুলো খুবই হীন প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে। অনেক ল্যাবরেটরী দাবী করে যে তারা বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা করতে পারদর্শী। কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে, সে-সব পরীক্ষা করার জন্য তাদের যোগ্য ব্যক্তি এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা এর কোনটাই নেই। একই সময়ে একই রক্ত বিভিন্ন ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করে দেখা গেছে এক-এক ল্যাবরেটরীর রিপোর্ট এক-এক রকমের। যৌন রোগ ও পরজীবী আক্রান্ত মল পরীক্ষার রিপোর্ট এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

অনেক ল্যাবরেটরী আছে যেখানে এ ধরনের পাঠানো কেসের শতকরা ৮০ ভাগের

পরীক্ষার রিপোর্ট হয়েছে পজিটিভ। যে-সব ল্যাবরেটরী এসব রিপোর্ট দিচ্ছে তাদের কাছে ব্যাপারটা যেন অনেকটা ডালভাতের মতই। যদি সিফিলিস পরীক্ষায় ল্যাবরেটরীর রিপোর্ট পজিটিভ বলা হয়, তখন রোগী শুধু মানসিক দিক দিয়েই বিপর্যস্ত হন না, সামাজিক লাজলজ্জা এবং অপমানেরও সম্মুখীন হন। এ কারণে পারিবারিক অশান্তি চরমভাবে দেখা দেয়।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও একথা সত্যি যে বেশকিছু তথাকথিত প্যাথলজিস্ট আছেন যারা অনুমান করে রিপোর্ট দিয়ে থাকেন—যাদের রিপোর্ট প্রাণঘাতী না হলেও এর কাছাকাছি। এটা চরম অবমাননাকরও বটে। তথাকথিত কৃমি, বক্র কৃমি, আমাশয় এবং giardia রোগের পরীক্ষায় হয় সবগুলো রোগ নতুবা দু'টো কিংবা তিনটা রোগ একসাথে মিলিয়ে মলের রিপোর্টে সবসময় পজিটিভ দেখিয়ে থাকেন। এ-সব রিপোর্ট নির্ভুল বলে ধরা হলে একথা স্বীকার করতেই হবে যে ঢাকা নগরীর মোট জনসংখ্যার প্রত্যেকেই এসব রোগে ভুগছেন। নিরীহ ডাক্তারগণ এ-সব রিপোর্টের ভিত্তিতে ব্যবস্থাপত্র দিয়ে থাকেন। ফলে বেচারী রুগীদের অর্থদণ্ড হয়, অথবা টেবলেট কিংবা সিরাপ গিলতে হয়। তারা হয়ত কোন একটি রোগে আক্রান্ত অথবা কোন রোগেই আক্রান্ত নয়। এই অজ্ঞতা ক্ষমার অযোগ্য হলেও এই অবস্থা দিব্যি চলছেই।

বাংলাদেশের কোন-কোন জায়গায় ম্যালেরিয়ার পুনরাবির্ভাবে ডাক্তার এবং প্যাথ-লজিস্টগণ যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। কতক ক্ষেত্রে ও অবস্থা চরমে এসে গেছে। শতকরা প্রায় ৮০-৯০টি স্লাইড পরীক্ষা করে ম্যালেরিয়ার জীবাণু পজিটিভ আছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। এর বেশীর ভাগ পুনরায় পরীক্ষা করা হয়েছে এবং দেখা গেছে রিপোর্টের ফলাফল হচ্ছে নেগেটিভ অর্থাৎ এতে ম্যালেরিয়া জীবাণুর কোন নামগন্ধও নেই। দুঃখজনক হলেও কিন্তু একথা সত্য যে, অধিকাংশ রোগীই চিকিৎসা শুরু করার আগে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করাতে আর্থিক দিক দিয়ে অসমর্থ।

এ-সব ক্ষেত্রে স্যালাইন এবং কুইনাইন দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। আমরা ম্যালেরিয়া প্রতিরোধক ক্লোরোকুইন এবং কুইনাইনে বিষাক্ত বিষক্রিয়ার কথা বলে থাকি। কিন্তু এই ওষুধগুলো সাধারণভাবে বহুল ব্যবহৃত। যত্নসহকারে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে অনেক ক্ষেত্রে এগুলো রুগীর আরোগ্যলাভের জন্য নয় বরং অজ্ঞতাজনিত কারণে রুগীকে দেয়া হয়।

অনেক রোগ আছে যেগুলো ম্যালেরিয়া বলে ভুল হয়। যেমন সেরেব্রো ভাসকুলার দুর্ঘটনা, মায়োকার্ডিয়েল ইনফার্কশন, মৃদু নিউমোনিয়া। এমনকি টাইফয়েড জ্বরেও 'পজিটিভ স্লাইড' দেখে তথাকথিত ম্যালেরিয়া রুগীদের বারটা বাজানো হচ্ছে। চিকিৎসা চলছে ম্যালেরিয়ার। কিন্তু রোগটা আসলে অন্য কিছু। এই যে রুগীদের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, এর খেসারত দেবে কে?

চিকিৎসক যেখানে দুর্বল

চিকিৎসক যেখানে দুর্বল, এবং রোগ নির্ণয়ে যার দক্ষতা অতি সীমিত, ল্যাবোরেটরী রিপোর্টের ওপর তিনি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। ফলে সঙ্কটের সৃষ্টি হয়

অনেক। পরবর্তী পর্যায়ে একই ল্যাবোরেটরী কিংবা ভিন্ন ল্যাবোরেটরীতে নেগেটিভ রিপোর্ট পাওয়া গেলে অর্থাৎ আগের পরীক্ষায় যা পাওয়া গেছে, তা যদি পাওয়া না যায়, তাহলে যুক্তি দেখানো হয় বিভিন্ন ধরনের। কখনও বলা হয় চিকিৎসার ফলে আসল যে রোগ তা সেরে গেছে, বর্তমান অবস্থাটা একটা উপসর্গ। কখনও বলা হয় রুগী একই সময়ে একাধিক রোগে ভুগছে। আসলে কিন্তু প্রথমবারের রিপোর্টেই গোলমাল ছিল। ওটা ভুল তথ্যপূর্ণ—ইচ্ছাকৃত অথবা অজ্ঞতাবশত। অনেক সময় এ-ধরনের রিপোর্ট দুর্বল চিকিৎসকের হাতে পড়ে রুগীকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়। পরিণতি ভয়াবহও হতে পারে। যেমন ধরুন যেটাকে ম্যালেরিয়া বলে চিকিৎসা করা হচ্ছে, সেটা যদি টাইফয়েড হয়, তাহলে? সময়মত টাইফয়েডের উপসর্গ দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। বর্তমানে যেখানে টাইফয়েডের চিকিৎসা চিকিৎসকের সম্পূর্ণ আয়ত্বাধীন সেখানে দূরদর্শিতার অভাবে একটা রুগীকে উপযুক্ত চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করা সত্যিই দুঃখজনক। তবুও এমন ঘটনা আজকালকার দিনে অজানা নয়।

সম্প্রতি এক্সরে মেশিন বসিয়ে যেখানে-সেখানে ব্যবসা শুরু করা সাধারণ একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। টাকা খাটালে মেশিন বসবে—এটা যেমন সোজা কথা, তেমনি মেশিন থেকে কতকগুলি এক্সরে তোলাও তেমন কোন কঠিন ব্যাপার নয়। যেমন বুকের (ফুসফুসের), হাড়ের, গলার, হাতের, পায়ের, সাইনাসের। কিন্তু মেরুদণ্ড, পাকস্থলী, পিত্তথলী, মূত্রকোষ এবং মূত্রথলী ইত্যাদি অঙ্গের যেখানে ওষুধ খেয়ে বা ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে এক্সরে করতে হয়—সেগুলো যেখানে-সেখানে করা যায় না এবং যে-কোন লোক করতে পারে না। আর সব এক্সরের বেলায় একটা সত্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই যে, রিপোর্ট লেখা যার তার কাজ নয়। শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং উপযুক্ত অভিজ্ঞতা না থাকলে ভুল রিপোর্টের মাধ্যমে এধরনের তথাকথিত রেডিওলজিস্ট মহা বিপদের কারণ হতে পারে। অনেক জায়গা থেকে এক্সরে করলে প্যাথলজি রিপোর্টের মত কিছু-না-কিছু দোষ সবক্ষেত্রেই যেন পাওয়া যায়।

অপ্রচলিত চিকিৎসা ও দুমূর্ল্য ওষুধ

পেপটিক আলসার বা পাকস্থলীতে ঘা বাংলাদেশে অন্যতম প্রধান রোগ। এক্সরে করে এই রোগ নির্ণয় অনেকটা সহজ। কিন্তু পেটের এক্সরে করালেই আলসার বলে প্রায়শ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়।

অথচ গুণগত বিচারে অনেক এক্সরেই নিকৃষ্ট ধরনের এবং রিপোর্টগুলোও সম্পূর্ণ মনগড়া এইসব রুগী অনভিজ্ঞ কিংবা দুর্বল চিকিৎসকের হাতে পড়লে রেহাই পায় না এটা যেমন সত্য, তেমনি দেখা যায় সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত এমনকি শিক্ষকতায় নিযুক্ত অথবা চিকিৎসক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত এমন ব্যক্তিও এ ধরনের রিপোর্টের শিকার হন। তাঁরা ওষুধের দীর্ঘ একটা তালিকা এবং তার সাথে একটা নির্দেশনামা দেন। কোন-কোন ক্ষেত্রে ছাপানো নির্দেশনামাও দেয়া হয়। এ-সবের পেছনে আবার ডাক্তার বিশেষের পেশাগত যোগ্যতা প্রচারের একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত নিহিত থাকে। ছাপানো নির্দেশনামার বিষয়বস্তু নিম্নরূপ: পেট খালি রাখবেন না; প্রতি দুঘণ্টা পর অবশ্যই

কিছু খাবেন ; প্রচুর বিশ্রাম নেবেন ; ধূমপান নিষিদ্ধ ; ঝাল ও মশলা একেবারে নিষিদ্ধ ইত্যাদি। খাবার-দাবারের এ-রকম ফিরিস্তির সাথে আরও আধ ডজন ওষুধ জুড়ে দেয়া হয়। এর মধ্যে এন্টাসিড, এন্টি কোলিনারজিক, সেডেটিভ, টনিক, হজমী এনজাইম উল্লেখযোগ্য। রুগীর কপাল যদি ভাল না হয়, তবে তার ব্যবস্থাপত্রে সাইমেটেডিন একটা আইটেম হিসাব থাকতে পারে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, দুঘণ্টা পর-পর খাবার কি প্রয়োজন আছে ? এমন এক সময় ছিল যখন হাসপাতালে প্রতিটি আলসার রুগীর জন্য একটা এক ঘণ্টা সময়ের চার্ট থাকতো। এতে খাবার এবং ওষুধ গ্রহণের সময় দেয়া থাকত। এবং এই চিকিৎসা ব্রিটিশ চিকিৎসা নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু এটা এখন অতীতের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতি ঘণ্টা অন্তর খাবার গ্রহণ আরও এসিড ক্ষরণ বাড়ায়। সম্প্রতি আমরা এ তথ্য অবগত হয়েছি।

সবচেয়ে যা প্রয়োজন তা হল এ্যান্টিকোলিনারজিক এবং এ্যান্টাসিডের মধ্যে সময়ের সামঞ্জস্য বিধান করা। খাবারের আধঘণ্টা আগে প্রথমটা এবং খাবারের এক ঘণ্টা পর দ্বিতীয়টা দিলে গ্যাস্ট্রিক অম্লতা বা এসিডিটি সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে। সেইসাথে ওষুধের সুফলও বেশী পাওয়া যায়।

সমাজের যে স্তরের লোক হোক না কেন, কাজে-কর্মে যারা ব্যস্ত থাকেন, তাদের পক্ষে প্রতি দুঘণ্টা পর খাবার গ্রহণ মোটেও সম্ভব নয়। রুগী বেচারী ওষুধের কার্যকর ফলাফল না পেয়ে নিজেকেই দোষারোপ করেন। এ কুফল তার নিজের দোষে নয় বরং ভুল উপদেশ-নির্দেশের কারণে ঘটে থাকে। যে ডাক্তার প্রাকটিস করে যাচ্ছেন এবং বাস্তব ও বর্তমান ধ্যান-ধারণা থেকে বহু পিছিয়ে আছেন, তার অজ্ঞতার কারণে রুগী নির্মম অবস্থার শিকার হন। এখানে সাইমেটিডিন (টেগামেট)-এর উল্লেখ প্রয়োজন। পেপটিক আলসারের চিকিৎসার ক্ষেত্রে এটি সর্বশেষ সংযোজন। আলসার নিরাময়ের ক্ষেত্রে এর প্রাথমিক আগ্রহ এবং সাফল্যের দাবী পরবর্তী পর্যায়ে অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। স্বল্পকালীন চিকিৎসায় রোগের পুনরাবির্ভাব এবং দীর্ঘ মেয়াদী চিকিৎসায় বিভিন্ন ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তদুপরি এর অস্বাভাবিক দাম এবং তথাকথিত জনপ্রিয়তা হারানোর অন্যতম কারণ।

এখন আমরা জানি যে এ্যান্টাসিডের উপযুক্ত মাত্রা সুফল বয়ে আনে। আলসারের চিকিৎসায় সাইমেটিডিনের বিশেষ স্থান থাকলেও তার অর্থ এই নয় যে পেপটিক আলসারের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন আছে। বিশ্বের অন্যতম গরীব দেশ বাংলাদেশে সাইমেটিডিনের মত মূল্যবান ওষুধের বিকল্প যখন বর্তমান, তখন বেশী দামের এই ওষুধ কেন ব্যবহার করা হচ্ছে, তা নিয়ে কথা উঠেছে। অনেকে বলতে পারেন জীবনের চেয়ে মূল্যবান তো কিছুই নেই ! যখন জীবন রক্ষার জন্য একটা দামী ওষুধ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই, সেখানে একথা প্রযোজ্য। কিন্তু যেখানে অপেক্ষাকৃত কম দামে একই ফলদায়ক ওষুধ বাজারে পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে ? যে দেশে শতকরা ৯০জন লোক দারিদ্র্যের চাপে অসহায় এবং নিরুপায় তাদের মাথায় এত দামী ওষুধের বোঝা চাপিয়ে দেয়া কি চরম নিষ্ঠুরতা নয় ?

সেকেলে প্রত্যাখ্যাত ধারণা রোগীর সংকট বৃদ্ধি করে

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশে জণ্ডিস বা পাণ্ডু রোগ অপরিচিত নয়। কিন্তু সাধারণের কাছে এটি একটি মারাত্মক রোগ বলে পরিচিত। হলুদ চোখ, হলুদ প্রস্রাব, পাণ্ডুর মুখমণ্ডল—সব মিলে ব্যাপারটা ভয়াবহ। যে-কোন মূল্যে এই ভয়াবহ রোগ থেকে মুক্তি পাবার জন্য একমাত্র ডাক্তারই ভরসা। সতর্কতার সঙ্গে আনুষঙ্গিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে গলস্টোন বা পিত্তথলির পাথরের মত রোগ নির্ণয় সম্ভব। এটা জণ্ডিসের অন্যতম প্রধান কারণ। অপারেশনের সাহায্যে এর আরোগ্য লাভ করা যায়। জণ্ডিসের আরও একটি প্রধান কারণ ভাইরাল হেপাটাইটিস। অর্থাৎ ভাইরাসের কারণে লিভারের প্রদাহ। এ-ধরনের জণ্ডিসের নির্দিষ্ট কোন ওষুধ নেই। কিন্তু রুগী বা তার আত্মীয়স্বজন রোগের ওষুধ নেই একথা মানতে রাজী নন। তাই খুব স্বাভাবিক কারণে তারা কিছু ওষুধ আশা করেন। সেক্ষেত্রে ডাক্তারের পক্ষে তিন, চার এমনকি পাঁচ ধরনের ওষুধ ব্যবস্থাপত্রে লিখে দেয়া তেমন কোন কঠিন কাজ নয়। এগুলোর মধ্যে টেরামাইসিনের মত এ্যান্টিবায়োটিক এবং কতকগুলো এমাইনো এসিডের তৈরী ওষুধ যাতে মেথিওনাইন এবং কোলিন আছে. সে-সবও ডাক্তার লিখে দেন। এ সব অনেক ওষুধের নামের আগে আবার লিভার কিংবা হেপা (যার মানে লিভার) লাগান থাকে যেমন : লিভারজেন, হেপাটোন. লাইপেস. ইত্যাদি।

প্রেসক্রিপশনে গ্লুকোজ সেলাইন লেখা আর একটি অতি সাধারণ বিষয়। অথচ যে রোগের জন্য এ-সব ওষুধ লেখা হয়, সে রোগের কোন উপকারই হয় না। এছাড়া এটা সর্বজনবিদিত যে টেরামাইসিনের মত এ্যান্টিবায়োটিক থেকে শুরু করে যে-সব টনিক দেয়া হয়—সবই লিভারের জন্য ক্ষতিকর। এসব ওষুধ দেয়ার অর্থই হল রোগের আক্রমণে ইতিমধ্যে লিভারের যে ক্ষতি হয়ে গেছে. তা আরও বাড়িয়ে দেয়া। যে-সব ক্ষেত্রে লিভারের বিশেষ ক্ষতির কারণে গুরুতর জণ্ডিস হয়েছে, সে-ক্ষেত্রে শিরায় টেরামাইসিন দেয়ার ফলে মৃত্যু হয়েছে, এমন দৃষ্টান্তও আছে।

দেশ-বিদেশে উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত যে জণ্ডিস রোগে খাবার-দাবারের প্রতি বিধিনিষেধ একেবারে অপ্রয়োজনীয় ও অযৌক্তিক। রুগী তার অভ্যাসমত খাবার খেয়ে যেতে পারেন। অতি সীমিত পরিমাণ চর্বিজাতীয় এবং বেশী পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট বা শর্করাজাতীয় খাদ্য খাবার যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে না। চিকিৎসকের ভুল নির্দেশে অনেকেই গ্লাসের পর গ্লাস গ্লুকোজএর শরবত খেতে থাকেন এবং এর ফলে বমি-বমি ভাব, মাথা ঘোরা, ইত্যাদিতে ভোগেন। অধিকন্তু খাবার-দাবারের বিধিনিষেধ একজন রুগীর প্রাত্যহিক নিয়মিত আহার কমিয়ে দেয়। ফলে সেটা তার মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলই ডেকে আনে। কারণ এতে আরোগ্য বিলম্বিত হয়। রুগীর সাধারণ দৈনন্দিন খাবারই প্রয়োজন। সর্বশেষ যুক্তিসম্মত ও বৈজ্ঞানিক বিধিব্যবস্থার পরিবর্তে একটা দীর্ঘদিনের প্রাচীন, সেকেলে সর্বোপরি প্রত্যাখ্যাত ব্যবস্থা মনেপ্রাণে আঁকড়ে রাখার ফলে রুগীদের প্রতি চরম নিষ্ঠুরতাই করা হয় এবং এতে সংকট কমে না, বরং বেড়ে যায়। প্রতিদিন শিরায় গ্লুকোজ এবং ভিটামিন

দেওয়া কোন-কোন চিকিৎসকের পক্ষে একটা নিয়মিত ব্যাপার। এতে নানা উপসর্গ দেখা দেয়। যেমন কাঁপুনি, অতি মাত্রায় জ্বর, ইত্যাদি।

ভাইরাল হেপাটাইটিস সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সম্প্রতি অনেক বদলে গেছে। আমরা জানি এই হেপাটাইটিস যে-সব ভাইরাসের কারণে হয়ে থাকে, সেগুলো তিন প্রকার—ভাইরাস-এ, ভাইরাস-বি এবং ভাইরাস নন্-এ-ও নন্-বি। এই তিন গ্রুপের ভাইরাসের যে-কোন একটার আক্রমণ অন্যটির আক্রমণ প্রতিহত করে না। ভাইরাস-এ সবচেয়ে কম শক্তিশালী এবং কোন রকমের জটিলতা সৃষ্টি করে না। খাবার দাবারের মাধ্যমে এর সংক্রমণ। অন্যদিকে ভাইরাস-বি এবং নন-এ-নন্-বি বিভিন্ন ধরনের ইন্‌জেকশনের মাধ্যমে রোগ ছড়ায়। একাধিক রুগীর দেহে একই সিরিঞ্জের বারবার ব্যবহার এই ধরনের ভাইরাসের বিস্তৃতি ঘটায়। এ-ছাড়া কোন কারণে রুগীকে যদি রক্ত দিতে হয় তবে তার মাধ্যমেও এই রোগ বিস্তৃতি লাভ করতে পারে—যদি উক্ত রক্ত ভাইরাসে সংক্রমিত বা দূষিত হয়ে থাকে।

ভিন্ন কোন রোগের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হয়ে ভাইরাল হেপাটাইটিসের শিকার হয়েছেন এমন অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। তথ্য নিলে দেখা যাবে যে হাসপাতালে থাকাকালে তাঁদের কয়েক ধরনের ইন্‌জেকশন দেয়া হয়েছে। উন্নত দেশগুলোতে ইন্‌জেকশনের সূচ ও সিরিঞ্জ একবার ব্যবহারের পর ফেলে দেয়া হলেও আমাদের দেশে এখনও একই কাঁচের সিরিঞ্জ ও সূচ অবিরাম ব্যবহৃত হচ্ছে। হাসপাতালে একই ওয়ার্ডের প্রায় সব রুগীকে একই সিরিঞ্জ দিয়ে ইন্‌জেকশন দেয়া হয়। এই সিরিঞ্জ দিয়ে ভাইরাল হেপাটাইটিস অতি সহজে আরেক জনের শরীরে সংক্রমিত হয়। এক ওয়ার্ডে ভাইরাল হেপাটাইটিসের একটা কি দুটো রুগী প্রায়ই ভর্তি থাকে। কাজেই অন্যান্য রুগীরা যে রোগের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হয় তা থেকে আরোগ্য লাভ করলেও বাসায় ফিরে যাবার সময় ভাইরাল হেপাটাইটিস সাথে নিয়ে যেতে পারে। তাদের সামান্যতম ধারণাও থাকে না যে তাঁদের শরীরে ইতিমধ্যে ভাইরাস সংক্রমিত হয়ে গেছে এবং কয়েক মাসের সুপ্তিকালের পর রোগের প্রকাশ ঘটতে পারে। অতীতের দিকে তাকালে বর্তমান যুগের যে-কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসক অন্তত মনেপ্রাণে স্বীকার করবেন যে অসম্পূর্ণ জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা মানুষকে কতটা ভুল পথে পরিচালিত করতে পারে। রোগ নির্ণয় বা রোগের চিকিৎসা বা প্রতিরোধ যাই হোক না কেন, চিকিৎসক এবং রোগী উভয়ের জন্য তা এক দুঃখজনক পরিণতি ডেকে আনে! বিভিন্ন সময়ে ভাইরাল হেপাটাইটিসের বিভিন্ন নামকরণ এই অসম্পূর্ণ জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা তথা অজ্ঞতার স্বাক্ষর বহন করে।

রক্তহীনতা

রক্তহীনতা আসলে কোন রোগ নয়—রোগের উপসর্গ। লোহিত কণিকার জটিলতা কিংবা অস্বাভাবিকতার মূলে এটি। এই উপসর্গ এমনই যে, এটা হলে রুগী খুব বেশী দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে যান এবং ডাক্তার ছাড়া বাঁচার আর কোন পথ খুঁজে পান না। কয়েক ধরনের রক্ত সৃষ্টিকারী টনিক ঝটপট্ লিখে দেয়া ডাক্তার-

প্রেসক্রিপ্শন

বাবুর জন্য অতি সাধারণ ব্যাপার। অনেককে আবার কিছু-কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে উপদেশ দেয়া হয়। অথচ প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্য যেমন ঃ রুগীর আর্থিক অবস্থা, পারিপার্শ্বিকতা, খাবার অভ্যাস—এসব জানার কোন আগ্রহ বোধ করেন না। কি কারণ রক্তহীনতার জন্য দায়ী—তাও উপেক্ষা করা হয়। ডাক্তার হয়ত একথা ভুলে যান যে রক্তহীনতার মূলে শরীরের কোন অঙ্গে প্রচ্ছন্ন বা লুক্কায়িত ক্যান্সার থেকে শুরু করে স্বল্পাহারের মত সাধারণ কারণও থাকতে পারে।

রক্তসৃষ্টিকারী বিভিন্ন ধরনের টনিকের মধ্যে চিকিৎসা করার মত প্রয়োজনীয় মাত্রায় আয়রন থাকে না বলে তা অপুষ্টিজনিত অভাব পূরণ করতে পারে না। অন্যদিকে এ সব টনিক কিনতে যে দাম পড়ে, তার চেয়ে অনেক কম দামের সাধারণ আয়রন ট্যাবলেটে একই কাজ হয়। এতে যে পয়সার অপচয় হয়, সেই পয়সা দিয়ে বাড়তি খাবার খাওয়া যায়। কিন্তু যাদের মধ্যে মারাত্মক কোন রোগ প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে, তাদের জন্য এটা খুবই বিপজ্জনক এজন্য যে, এ-সব ব্যবহারের পর শুরুতে কিছুটা উন্নতি মনে হলেও পরবর্তিতে রোগ নির্ণয়ে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় এবং প্রচ্ছন্ন রোগটি বেড়েই চলে। অবশেষে চিকিৎসা আয়ত্বের বাইরে চলে যায়। শরীরে হেমোগ্লোবিনের অভাব মিটিয়ে রক্তহীনতা সারিয়ে তুলবে এই আশায় হেমোগ্লোবিন নামের ওষুধ যথেচ্ছভাবে দেয়া হয়। এটা সত্যি দুঃখজনক। এ ধরনের এক বোতল টনিকের দাম অবস্থাভেদ আশি থেকে একশত টাকা। কিন্তু নামটার মোহে পড়ে রুগীরা বোকা বনে যান। এবং শুধু অর্থের অপচয় করেন না। বরং চিকিৎসাজনিত মারাত্মক অবস্থারও সম্মুখীন হন। অবস্থার উন্নতি বা অবনতি যাই হোক না কেন, রোগী কিন্তু এই ওষুধকে মহৌষধ মনে করে খুব তৃপ্তির সাথে সেবন করেন। যারা কিছুদিন পর বুঝতে পারেন যে তাদের অবস্থা উন্নতির চেয়ে অবনতির দিকে, তারা এই মহৌষধকে বিন্দুমাত্র দায়ী না করে নিজেদের কপাল মন্দ বলে দুঃখ করেন। যে ডাক্তার তাদের চিকিৎসা করেন, তাঁর প্রতি অগাধ বিশ্বাসের কারণে প্রেসক্রিপ্শনের গলদ তাদের চোখে ধরা পড়ে না।

এই বিশেষ ওষুধের এবং এ ধরনের অন্য ওষুধের জনপ্রিয়তার রহস্য কি তা জানা নেই। তবে এটা জানা আছে যে এর পিছনে আমাদের প্রচুর মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় হচ্ছে। সময় এসেছে এ-সব ওষুধ চিরতরে নির্বাসিত করার। সময় এসেছে রক্ত সৃষ্টিকারী নয়, রক্ত শোষণকারী এসব নিষ্ঠুর প্রেসক্রিপ্শনের যাঁতাকল থেকে রুগীদের বাঁচাবার।

রক্তহীনতার কারণ ও ধরণ জানার জন্য সতর্ক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়। একটি শিশুর রক্তহীনতার জন্য মল সাধারণভাবে পরীক্ষা করালে হয়তো এতে বিভিন্ন কৃমির উপস্থিতি জানা যাবে।

বিভিন্ন ধরণের ডায়রিয়া, বদ হজম, ঘন-ঘন সন্তান প্রসব, পেটে অপারেশন প্রভৃতি কারণে যে রক্তহীনতা দেখা দেয় তাতে সাধারণত আয়রন এবং ফলিক এসিড দুটোরই অভাব দেখা যায়। রোগের বিস্তারিত ইতিহাস থেকে এগুলো অনুমান করা সহজ এবং সামান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করাও সম্ভব। এ-সব ক্ষেত্রে শুধু

আয়রন খাওয়ালেই রক্তহীনতা দূর হবে না বরং একইসাথে ফলিক এসিড সেবনও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

রুগীদের অনেক সময় ভিটামিন বি$_{12}$ দেওয়া হয়। এই ভিটামিনের অভাব আমাদের দেশে হয় না বললেই চলে। এই ধরণের ভিটামিনের অভাবে এক সাংঘাতিক ধরণের রক্তহীনতা (পারনিশাস এ্যানিমিয়া) দেখা দিতে পারে। বিভিন্ন কারণে এ ধরণের রক্তশূন্যতা বাংলাদেশে দেখা যায় না। তাছাড়া ভিটামিন বি$_{12}$ যে-পরিমাণ দেয়া হয়ে থাকে কিংবা বিভিন্ন টনিকে যে-পরিমাণ থাকে, তাও কোন কাজে আসতে পারে না। রুগীর টাকা-পয়সা নষ্ট হয়, সময়ের অপচয় হয়, কিন্তু রক্তহীনতা দূর হয় না। এক্ষেত্রে আয়রন ও ফলিক এসিড আলাদাভাবে বা একসাথে দিলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে রুগী ভালো হয়ে যেতে পারেন গরীব রুগী যাদের ওষুধ কেনার সামর্থ্য নেই, তাদের উপর ওষুধ কেনার দণ্ড না ঘটিয়ে রোগের আসল কারণ দূর করে বিভিন্ন শাক্-সবজী খাওয়ার উপদেশ দিলে ভাল হয় এবং অতি অল্প সময়ে সুফল পাওয়া যায়।

জ্বর

সারা বাংলাদেশ খুঁজলে এমন কাউকে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ যার জীবনে একবারও জ্বর হয়নি। ঘুসঘুসে জ্বর থেকে শুরু করে উচ্চ তাপমাত্রার জ্বরও সবার হতে পারে। এই সমস্ত জ্বরের বেলায় রোগ নির্ণয় ভুল হওয়া খুবই স্বাভাবিক—বিশেষ করে প্রথম কয়েক দিনের মধ্যে। জ্বরের সাথে সামান্য সর্দি-কাশি অথবা ঠাণ্ডা লাগাকে সর্দিজ্বর বলা হয়। বিনা চিকিৎসায় কয়েকদিনের মধ্যে আপনাআপনি তা সেরে যায়। অন্যদিকে একই ধরণের লক্ষণে এমন রোগও হতে পারে যা ঠিকমত চিকিৎসা না করলে জটিলতা দেখা দিতে পারে।

শুরুতে অতি উৎসাহী হয়ে বিনা দ্বিধায় এক বা একাধিক এ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ শুধু অযৌক্তিক নয়—সর্দিজ্বরের বেলায় (যেটি খুবই সাধারণ) একটা ভুল বিশ্বাসের সৃষ্টি করতে পারে। কারণ এ জ্বরের উপশম স্বাভাবিকভাবেই হয়—এ্যান্টিবায়োটিকের জন্য নয়। অথচ এ ধরনের এ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে আমরা সকলে ভুল চিকিৎসা করেও বাহবা কুড়াই এবং অসহায় রুগীদের আর্থিক অনটন বাড়াই। ভালভাবে পরীক্ষা করে সঠিক রোগ নির্ণয় করার আগে এ্যান্টিবায়োটিক দেবার অতি উৎসাহ অনেক সময় রোগ নির্ণয়ে সংকটের সৃষ্টি করে।

টাইফয়েড জ্বর হলে টেট্রাসাইক্লিন, পেনিসিলিন কিংবা স্ট্রেপটোমাইসিন দিলে কোন কাজ হবে না। এ-সব ওষুধ দেয়ার তিন চার দিনের মধ্যে জ্বর যদি না কমে তখন কোট্রাইমোক্সাজোল, কোট্রিম, থোরাট্রিম, সেপটাজল দেয়ার উপদেশ দেয়া হয়। সাথে ক্লোরোকুইনের মত এ্যান্টি-ম্যালেরিয়া ওষুধও। টাইফয়েড হলে কোট্রাইমোক্সাজোল খুবই কার্যকর হয় কিন্তু কাজ ধীরে-ধীরে করে এবং জ্বর কমাতে সময় নেয়। যদি ডাক্তারবাবুর একথা মনে না থাকে তবে আত্মীয়স্বজনের উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার সাথে তিনি একটার পর একটা ওষুধ যোগ করতে থাকেন। প্রায় রুগীই গরীব। অনেক ক্ষেত্রে তারা ঘরের জিনিসপত্র বেচে ওষুধের দাম জোগাড় করেন। রুগী ওষুধ কিনে

সেবন করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোন উপকার পান না। অনেক সময় আর্থিক চাপ এত বেড়ে যায় যে রুগীর আর ওষুধ কেনা হয়ে ওঠে না। যখন তারা বড় ডাক্তার বা হাসপাতালে যেতে মনস্থ করেন, তখন অনেক সময় দেখা যায় যে ওষুধ কেনা দূরের কথা, বড় ডাক্তারের ফিসও জোগাড় করতে পারেন না। এদিকে হাসপাতালে ভর্তি হবেন এ চিন্তাও তারা করতে পারেন না। তাদের মতে হাসপাতালের চিকিৎসাব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ এবং অধিকাংশ রুগী সেখানে মারা যান।

যদি সতর্কতার সাথে রোগের ইতিহাস নেয়া হত, বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হত, তাহলে চিকিৎসকের দৃষ্টিতে সঠিক রোগ ঠিকই ধরা পড়ত। অপেক্ষাকৃত ধীর নাড়ির গতি, জিভের উপর আস্তরন, তলপেটের ডানদিকের নিচের অংশে চাপ দিলে ব্যথা, মুখের চেহারায় বিকৃতি বা পরিবর্তন—এ-সব দেখে অতি সহজে টাইফয়েড নির্ণয় করা যায়। কোট্রাই মোক্সাজোল এবং ক্লোরোমাইসেটিন টাইফয়েড রোগের জন্য বিশেষ উপকারী ওষুধ হলেও এগুলো বিশেষ করে ক্লোরোমাইসেটিন দেয়া রক্ত তৈরীর উপাদানগুলোর জন্য বিপজ্জনক। এর ফলে এগ্রেনুলোসাইটোসিসের মত মারাত্মক অবস্থা হতে পারে। এই ওষুধগুলোর যে কোন একটি টাইফয়েডের জন্য যথেষ্ট হলেও প্রায় প্রেসক্রিপশনে এ-দুটো ওষুধ একসঙ্গে দিতে দেখা যায়। যদিও এ দুটো ওষুধ কয়েকটি মৃত্যুর জন্য দায়ী, তবুও রোগের ওপর দোষ চাপানো হয়, এগুলোর ওপর নয়। বলা হয় 'কপাল খারাপ'।

ওষুধের অপপ্রয়োগ সম্বন্ধে অনেক উদাহরণ দেয়া যায়। এই রাজধানী ঢাকা শহরে আমরা একজন প্রফেসরকে হারিয়েছি যাঁকে সেরিব্রোভাসকুলার দুর্ঘটনা বা মস্তিকে রক্ত ক্ষরণের পর মরফিন ইনজেকশন দেওয়া হয়। যার ফলে তাঁর জ্ঞান আর কোনদিন ফিরে আসেনি। এই নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে তিনি কোন প্রতিবাদও করতে পারেননি। এমন অনেক ঘটনা আছে যেখানে হৃৎপিন্ডজনিত এবং শ্বাসনালীজনিত হাঁপানী পার্থক্য না করেই একটি এ্যাডরেনালীন ইনজেকশন হৃদপিন্ডের জন্য মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যায় এটা শ্বাসনালীজনিত হাঁপানীতে যেমন উপকারী, হৃদপিন্ড-জনিত হাঁপানিতে তেমনি মারাত্মক।

এধরনের অনেক ঘটনা আছে যে গ্রন্থাকারে লিখেও শেষ করা যাবে না। কিন্তু এ-সব ঘটনা থেকে একটি সত্যই ফুটে ওঠে যে অসহায় রুগীরা ওষুধের অপপ্রয়োগের ফলে কিভাবে মৃত্যুবরণ করেন। সব ক্ষেত্রে এই অপপ্রয়োগ ইচ্ছাকৃত নয়। অজ্ঞতা কোনদিনও আশীর্বাদ বয়ে আনতে পারে না। উদাসীনতা কখনও সহ্য করা যায় না। আমরা যখন রুগীর স্বাস্থ্য, আরোগ্য এবং সুখের জন্য দায়ী, তাদের উপর অবাঞ্ছিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার বোঝা, সেকেলে ও অপ্রচলিত উপদেশের শাস্তি, অজ্ঞতাপ্রসূত প্রেসক্রিপশনের মারণাস্ত্র এবং উদাসীনতার নিষ্ঠুরতা চাপাবার অধিকার আমাদের নেই। অপ্রয়োজনীয় ওষুধ গরীব রুগীদের ওপর চাপিয়ে তাদের আর্থিক চরম অবস্থা সৃষ্টি করা কোনক্রমেই আমাদের উচিত নয়। কম দামী ওষুধে যেখানে আরোগ্য সম্ভব, সেখানে বিদেশী দামী ওষুধ দেয়া শত্রুতার সামিল। তারা আমাদের কাছে আসেন অগাধ বিশ্বাস নিয়ে আরোগ্য লাভের আশায়। এ-বিশ্বাসের যথাযথ মর্যাদা দিতে হবে। এটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

কেন এত ওষুধ

আমার স্কুল জীবন গ্রামেই কাটে। এখনও আমি ছোটবেলার আমার সে-গ্রাম থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারিনি। বছরে অন্তত দুবার সেখানে যাবার সুযোগ নিই—পবিত্র ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহার দিনে। বিগত চার-পাঁচ দশকে আমার গ্রামের নামের পরিবর্তন হয়নি—আয়তন, বৃদ্ধি পায়নি। কিন্তু লোকসংখ্যা বেড়েছে তিনগুণ। মনে পড়ে ছোটবেলায় অসুখ হলে মা কত ধরনের গাছ-পাতার রস, এটা-সেটা খেতে দিতেন। দুই-এক দিনের মধ্যে উপশম না হলে গ্রামের সর্বজন শ্রদ্ধেয় 'হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ঈশ্বরচন্দ্র'কে নিয়ে আসতেন। আমারও ভাল লাগত। কারণ তিনি আমার পছন্দসই ডাক্তার ছিলেন। ওষুধের পরিমাণ ছিল কম আর খেতেও মিষ্টি লাগত। মাত্র কয়েক ফোঁটা ওষুধ কিংবা কয়েকটা পুরিয়া দিনে দুই-একবার। আমার অতি প্রিয় সেই ঈশ্বরডাক্তার আর নেই। পরিবারের আমরা সবাই এখন শহুরে। আত্মীয়-স্বজন যাঁরা আছেন, তাদের দেখি অসুখ হলে নানা ধরনের ডাক্তারের সাহায্য নিতে। এদের কেউ হোমিওপ্যাথ, কেউ কবিরাজ, কেউ এলোপ্যাথিক, আবার কেউবা সবকিছু। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, যে যাই হোন না কেন, প্রত্যেকে যেন প্রত্যেক ওষুধে পারদর্শী। একজন হোমিওপ্যাথের প্রেসক্রিপশনের এলোপ্যাথিক ওষুধ থাকা অস্বাভাবিক নয়। এন্টিবায়োটিক, হজমী ওষুধ, টনিক, ভিটামিন সবকিছু কোন-না -কোন প্রেসক্রিপশনে স্থান পায়। আবার সবসময় যে ডাক্তারের নির্দেশে ওষুধ কেনা হয়, এমন কথা নয়। গ্রামেগঞ্জে এখন আর সে পরিবেশ নেই। ওষুধ আর চায়ের দোকান যেন পরস্পর প্রতিযোগী হিসাবে গড়ে উঠেছে। অনেক ক্ষেত্রে পাশাপাশি। যাঁরা ওষুধের ব্যবসা করেন, কিছুসংখ্যক ইংরেজী পড়তে এবং বুঝতেও পারেন। কেউ-কেউ কষ্টের সাথে পড়তে পারেন, আর কেউ তাও পারেন না শুধু বাংলা জানেন। ওষুধের গুণাগুণ সম্বন্ধে জানা এদের পক্ষে আদৌ কঠিন নয়। কোম্পানীর বিভিন্ন আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন আর ওষুধের সাথে দেয়া ছাড়পত্র বিভিন্ন ভাষায় লেখা থাকে। বাংলায় থাকবেই। এগুলোতে যা গুণাগুণ বর্ণনা, সেটাই তাদের সম্বল। শুধু সম্বল বললেই হয়ত-বা ভুল হবে। এত বড় কোম্পানী এত সুন্দর কাগজে লেখা আর এমন একটা ওষুধ—এগুলো সবই সত্য। এতে কোন ভুলভ্রান্তির অবকাশ নেই—এটাই তাদের বদ্ধমূল ধারণা। এছাড়া প্রেসক্রিপ্শন তথা ব্যবস্থাপত্র যেখান থেকেই হোক না কেন, যার হাতে লেখা হোক না কেন, শহর থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে শহরে, তা আনাগোনা করবেই। শহরে কাজ করে এমন লোকের মারফত এগুলো গ্রামে আসে। আবার এদের মাধ্যমে গ্রাম থেকে শহরে যায়। গ্রামমুখী প্রেসক্রিপ্শনের গুরুত্ব এখানেই বেশী। শহরের পাশ করা ছোটবড় ডাক্তারের প্রেসক্রিপ্শন গ্রামের সেই ডাক্তার সমাজের

উপর প্রভাব বিস্তার করে অনেক। উচ্চশিক্ষিত ডাক্তারের বেলায় তার পরিমাণ কতটুকু তা সহজেই অনুমান করা যায়।

আমরা যারা ভাগ্যবান উচ্চ শিক্ষিত, আমাদের দায়িত্ব অপরিসীম। আমরা যা জানি, আমরা যা করি, আমরা যা লিখি, তা শুধু আমাদের এবং আমাদের রুগীদের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়, শত-শত গ্রামীণ ডাক্তার, হাজার-হাজার শিক্ষিত লোক এগুলো থেকেই চিকিৎসা সম্বন্ধে ধারণা লাভ করেন, ওষুধ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হন। আমাদের দায়িত্ব যেখানে এত বেশী, সেখানে নিঃসন্দেহে আমাদের সজাগ হতে হবে। আজকের আলোচ্য বিষয়: ব্যবস্থাপত্রে বা প্রেসক্রিপ্শনে কত ওষুধ লিখতে হবে এবং কেনই বা এত বেশী ওষুধ আমরা লিখে থাকি।

অসুখ যেখানে একটা, ওষুধও সেখানে একটা হবে এটাই স্বাভাবিক। কোন না কোন ক্ষেত্রে বিশেষ কারণে একটা অসুখের জন্য একাধিক ওষুধ দেয়া অপরিহার্য। এই ধরনের অসুখের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, কুষ্ঠ এই তিনটি ব্যাপক বিস্তৃত রোগে একসাথে একাধিক ওষুধ দিতে হয়। তা-ও দুই বা তিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ ছাড়া লিউকিমিয়া বা ক্যান্সারজাতীয় রোগে যেখানে একসাথে একাধিক ওষুধ দিতে হয়, সেগুলোর চিকিৎসা সাধারণ চিকিৎসকের আওতার বাইরে। মোটকথা—উপযুক্ত প্রতিকারমূলক ওষুধ পাওয়া গেলে একটা অসুখে একটা ওষুধই যথেষ্ট। প্রশ্ন উঠতে পারে, দরিদ্র দেশগুলোতে অনেক রোগ মোটামুটিভাবে অনেকেরই জীবন-সঙ্গী। যেমন ডিসেন্টি্র বা আমাশয়, বিভিন্ন ধরনের ক্রিমি, অপুষ্টি, নানা ধরনের চর্মরোগ ইত্যাদি। এখন যদি একজন লোকের নিউমোনিয়া হয়, এমনকি সেই একই লোকের পেটে ক্রিমি থাকে, আমাশয় এবং চামড়ায় ঘা থাকে, তাহলে কি হবে? এর প্রত্যেকটির চিকিৎসা করা উচিত এ-বিষয়ে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। প্রত্যেকটির জন্য যদি একটা করে ওষুধ লেখা হয়, তাহলে মোট ওষুধের সংখ্যা দাঁড়ায় কমপক্ষে চারটি। রুগী যদি এখানে চারটির মধ্যে যে-কোন দুইটি বা তিনটি ওষুধ ব্যবহার করেন এবং এতে নিউমোনিয়ার ওষুধ বাদ পড়ে, তাহলে যেটা আসল এবং মুখ্য অসুখ, যেটার চিকিৎসা বিলম্বিত হলে পরিস্থিতি সংকটময় হতে পারে, সেটার চিকিৎসাই এখানে বাদ পড়ল। এই ধরনের ঘটনা ক্ষেত্রে অনেকে অকাল মৃত্যুর কারণ হয়েছে এর নজির মেলে। এটা কিন্তু রুগীর কারণে নয়—রুগীর অজ্ঞতার জন্যে। যে চারটি ওষুধ দেয়া হয়েছে, এর মধ্যে কোনটি মুখ্য এবং কোনটি গৌণ, সেটা তার জানা নেই। সে তার রোগগুলোকে আলাদা করে ভাবতে পারে না এবং কোন্ রোগের জন্য কি ওষুধ দেয়া হয়েছে, তাও জানে না। সব অসুখ সামগ্রিক-ভাবে বিচার না করলেও সে জানে ডাক্তার তাকে ওষুধ দিয়েছে অসুখ সারাবার জন্য। সে ওষুধগুলোর কিছু-না-কিছু খেলে কিছু-না-কিছু উপকার হবে, এটাই তার ধারণা। তার বর্তমান লক্ষণগুলো নতুন—সেটা সে জানে। কিন্তু এই নতুন রোগের জন্য কি ওষুধ দেয়া হয়েছে, সেটা তার জানা নেই। অথচ দুই-তিনটি ওষুধ ব্যবহার করেও যে ওষুধটা বাদ পড়ল, সেটাই ছিল তার অতি প্রয়োজনীয় এবং বর্তমানের জটিল রোগ নিউমোনিয়ার জন্য। এহেন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে গেলে একজন

রুগীকে নয়, গোটা সমস্যাকে উপলব্ধি করতে হবে। রোগের প্রাধান্য, তৎসংলগ্ন জটিলতা, রুগীর আর্থিক সঙ্গতি এবং তার বুঝবার ক্ষমতা—সবকিছু বিচার করে দেখতে হবে। নিউমোনিয়াই যেখানে মুখ্য রোগ, সেটার চিকিৎসা করা সহজ অথচ বিলম্বিত চিকিৎসা বিঘ্ন ঘটাতে পারে এবং ভয়াবহ পরিণতির সৃষ্টি করতে পারে। উপযুক্ত ওষুধ দিয়ে সেটারই প্রথম চিকিৎসা করতে হবে। অন্যদিকে আমাশয়, ক্রিমি এবং চর্মরোগের চিকিৎসা নিউমোনিয়ার সাথে জড়িত করলে জটিলতার সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক।

একসাথে অনেক ওষুধ ব্যবহারের অন্য একটি দিকও আছে। ওষুধটা রাসায়নিক পদার্থ বিধায় কয়েকটির সংমিশ্রণের ফলে বিভিন্ন ধরণের অন্তঃ এবং পার্শ্ববিক্রিয়া ঘটতে পারে। ফলে ওষুধের কার্যকারিতা কমতে পারে এবং জটিলতাও বাড়তে পারে।

মোট কথা—প্রেসক্রিপ্‌শন বা ব্যবস্থাপত্রে ন্যূনতম ওষুধ লেখা বাঞ্ছনীয়। তবুও প্রতিনিয়ত আমরা দেখতে পাই প্রেসক্রিপ্‌শনে ওষুধের ছড়াছড়ি। কেন এমন হয়?

ডাঃ ডি. লরেন্স এবং জে. ডি. ব্ল্যাক প্রণীত 'দি মেডিসিন ইউ টেইক্' অথবা 'যে ওষুধ আপনি খান' গ্রন্থের উদ্ধৃতি এখানে যুক্তিসঙ্গত। ব্যবস্থাপত্র স্থানভেদে ভিন্ন-ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। আমেরিকার নর্থ কেরোলিনায় একশতজন ডাক্তারের তিন-দিনের প্রেসক্রিপশনের ওপর একটা সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। এতে দেখা যায় একজন ডাক্তার একজন রুগীকে পরীক্ষা করে যত কম জানতে পারেন, তিনি তাকে তত বেশী ওষুধ দিয়ে থাকেন।

১৯৭৬ সালের লণ্ডনের 'জার্নাল অব রয়েল কলেজ অব ফিজিশিয়ানস'-এর সম্পাদকীয়ের কিছু অংশের উদ্ধৃতি এখানে দেয়া হল। 'প্রত্যেকটি ব্যবস্থাপত্র চিকিৎসকরা সূক্ষ্ম বিচার-বিবেচনার ভিত্তিতে দেন না। বস্তুত সমস্ত চিকিৎসক-সমাজকে প্রচলিত ওষুধের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার না করার জন্য সমালোচনা করা যেতে পারে।'

গ্রন্থকারদ্বয় উপযুক্ত উদ্ধৃতির পর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, প্রেসক্রিপ্‌শন লেখা অতি সহজ ব্যাপার। এতে দরকার হয় শুধুমাত্র একটা কলম এবং এক টুকরো কাগজ। মানসিক অশান্তি এবং দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছে এমন রুগী থেকে রেহাই পাবার জন্য অনেক সময় তাড়াতাড়ি ব্যবস্থাপত্র দেয়া হয়। ডাক্তার জানেন, সেগুলোর জন্য তার তেমন কিছু করার নেই। আসলে ডাক্তাররাও তো মানুষ। অন্যান্য মানুষের মত তাদেরও ক্লান্তি আসে, ক্ষুধা পায়। সমাধানযোগ্য নয় এমন সমস্যা থেকে তারাও রেহাই পেতে চান। এইসব সমস্যা নিয়ে যে-সব রুগী আসে তাদের থেকে রেহাই পাবার জন্য তাড়াহুড়া করে তারা প্রেসক্রিপ্‌শন লেখেন।'

বিভিন্ন কারণে রোগ নির্ণয় যেখানে সম্ভব নয় কিংবা আর্থিক অভাব হেতু পরীক্ষা নিরীক্ষা যেখানে করা যায় না, সেখানে অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মত অনেক ওষুধের সংমিশ্রণ করা হয়। তাড়াতাড়ি রোগ সারিয়ে তোলার প্রয়াসে চিকিৎসক যখন উৎকণ্ঠিত হন, জগাখিচুড়ী প্রেসক্রিপ্‌শন বা ব্যবস্থাপত্র সেখানে অনিবার্য। যেমন ধরুন প্রথম বা দ্বিতীয় দিনের জ্বর নিয়ে কেউ যদি পরামর্শের জন্য আসে, সেখানে সঠিকভাবে রোগ

নির্ণয় অনেক সময় সহজ নয়। সামান্য সর্দিজ্বর কিংবা ভাইরাসজনিত জ্বর থেকে আরম্ভ করে নিউমোনিয়া, টাইফয়েড এমনি আরও বিভিন্ন ধরনের রোগের সম্ভাবনা সেখানে উড়িয়ে দেয়া যায় না। জ্বরের মাত্রা বেশী হলে সাময়িকভাবে তা কমানোর জন্য প্যারাসিটামল বা এস্‌পিরিন জাতীয় ওষুধ দেয়ার পর সর্দি কিংবা ভাইরাসজনিত জ্বর দু-একদিনের মধ্যে সেরে যাবার কথা। তা যদি না হয় তাহলে ইতিমধ্যে অন্য সব লক্ষণ প্রকাশ পাবে এবং দরকার হলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা সহজ হয়ে উঠবে। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে ধৈর্যের চেয়ে অধৈর্যের প্রমাণ বেশী মেলে। দুই-একদিন অপেক্ষা করার চেয়ে অযৌক্তিকভাবে দুই-তিনটা ওষুধের সংমিশ্রণ দেয়া হয় যাতে থাকে ম্যালেরিয়ার জন্য টেবলেট, টাইফয়েডের জন্য ক্যাপসুল, হজমীর জন্য টনিক, ঘুমের ওষুধ ইত্যাদি। সর্বমিলে এমনি করে একই প্রেসক্রিপ্‌শনে ছয়-সাতটি ওষুধও লেখা হয়। রোগ নির্ণয় না করে রোগীর উৎকণ্ঠার কারণে উপশমের প্রয়াসে প্রেসক্রিপ্‌শনে জটিলতার সৃষ্টি হয়।

অনেক সময় বিত্তশালী রুগীর প্রভাব চিকিৎসকের মাধ্যমে প্রেসক্রিপ্‌শনেও প্রতিফলিত হয়। প্রভাবশালী ব্যক্তিবিশেষের কোন ওষুধের প্রতি বিশ্বাস কিংবা আকর্ষণ অহেতুক হলেও তাদের অনুরোধে কোন-কোন ওষুধ প্রেসকিপশনের অন্তর্ভুক্ত হয়, রোগের চাহিদা অনুসারে নয়। নিঃসন্দেহে ডাক্তারদের এ ধরনের চাপ প্রতিরোধ করতে হবে। তবে অনেকক্ষেত্রে তা হয়ে ওঠে না। বার বার পীড়াপীড়ি করে সময় নষ্ট করার চেয়ে একজন অত্যন্ত কর্মব্যস্ত চিকিৎসকের পক্ষে তাড়াতাড়ি প্রেসক্রিপ্‌শন লিখে বিদায় দিয়ে পরবর্তী রুগী পরীক্ষা করা এহেন পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাবার একটা সহজ উপায়। অনেক দেশে প্রতি রুগীর পিছনে একজন ডাক্তার যে সময় দেন, তা পাঁচ মিনিটেরও কম।

উপসংহারে ডাঃ লরেন্স ও ডাঃ ব্ল্যাক কয়েকটি বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁদের কথায়, (১) যুক্তিসঙ্গত ব্যবহারে ওষুধ অনেক উপকারে আসতে পারে এবং অপকারিতা হ্রাস পায়। (২) অযৌক্তিক এবং ওষুধের খামখেয়ালী ব্যবহারের জন্য চিকিৎসকদের সমালোচনা প্রত্যাশিত এবং ন্যায়সঙ্গত। (৩) ওষুধের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহারের উদ্দেশ্যকে সফল করে তোলার জন্য জনসাধারণকে অবহিত করা একান্ত প্রয়োজন; এতে ওষুধের কিছুটা গুণাগুণ বিচার করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়।' এই দায়িত্ব কাদের ওপর, সেটাই বিচার্য।

মিলটন সিলভারম্যান, ফিলিপলি এবং মিয়া লিডেকার তাঁদের 'প্রেসক্রিপশন ফর ডেথ' বা 'মৃত্যুর ব্যবস্থাপত্র' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, একজন আমেরিকান চিকিৎসক তাঞ্জানিয়ায় তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন, 'সেখানে একজন চিকিৎসক প্রতি ঘণ্টায় ১২-১৪ জন রুগী দেখেন। এমনকি প্রতি মিনিটে একজন করে রুগী দেখতেও দেখা যায়। তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশেও এটা দেখা গেছে। রুগী তার লক্ষণ বর্ণনা শেষ করার আগেই দেখা যায় তার জন্য প্রেসক্রিপ্‌শন লেখা শেষ হয়ে গেছে। তৃতীয় বিশ্বের সর্বত্র প্রত্যেক চিকিৎসকের পিছনে দেখা যায় সারি সারি রুগী। পশ্চিমা দেশগুলোর তুলনায় তাদের রুগীর সংখ্যা অনেক বেশী। সে-কারণে কোন্ ওষুধ

বাজারে কিংবা দেশে বেশী চলবে, তা অনেকটা তাদের ওপর নির্ভর করে। ওষুধ কোম্পানীগুলোও এ-সম্বন্ধে পরিপূর্ণ ওয়াকিবহাল এবং এ-জন্যই তাদের নিজেদের স্বার্থে যেন-তেন প্রকারে তাদের সন্তুষ্ট করতে প্রয়াসী। এমনকি এই উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে উৎকোচ প্রদানও করে থাকে।'

সুন্দর কাগজে ছাপানো তথাকথিত বিভিন্ন ধরনের পরিসংখ্যানের মাধ্যমে মিথ্যা তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এরা চিকিৎসক সমাজকে বিভ্রান্ত করতে প্রয়াস পায়। এমনকি এ-সব প্রচারপত্র উন্নত এবং দরিদ্র দেশে তথ্যের দিক দিয়ে একইভাবে প্রকাশ পায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে গ্লাক্সো কোম্পানী তৃতীয় বিশ্বের কোন-কোন দেশে নিম্নোক্ত বক্তব্য রেখেছে ঃ

'সম্প্রতি ভিটামিন বি$_{12}$-এর টনিক হিসাবে এর উপকারিতা প্রমাণিত হয়েছে ···। ভিটামিন বি$_{12}$দেহ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, শারীরিক কর্মক্ষমতা বাড়ায় ···।' কিন্তু এ নিয়ে উন্নত দেশে আজ পর্যন্ত এ-ধরনের কোন বিজ্ঞাপন দেয়া হয়নি। এখন বুঝে দেখুন, এমন একটা প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীর মাধ্যমে যেটা প্রকাশ পায়, তার প্রভাব কতটুকু হতে পারে। সাইটামিন তথা ভিটামিন বি$_{12}$ অনেকের কাছে একটা মহৌষধ। অন্তত কোম্পানীর কথায় তাই প্রমাণ করে। ফলে সাইটামিন-এর প্রেসক্রিপ্শন যখন-তখন যেখানে-সেখানে দেয়া হয়। শারীরিক দুর্বলতা থেকে আরম্ভ করে সাধারণ রক্তহীনতা, এমনকি ক্ষুধা মন্দা প্রত্যেকটি অসুখের জন্য এটা যেন একটা প্রমাণিত উপযোগী ওষুধ। অথচ এ-সবের কোনটার জন্যই সাইটামিন বা বি প্রয়োগের কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই।

এমনি ধরনের অনেক তথাকথিত ওষুধ বাজারে ওষুধ কিংবা মহৌষধ নামে পরিচিত হলেও সেগুলোর পিছনে রয়েছে কোম্পানীর বলিষ্ঠ প্রচার মাধ্যম আর আমাদের অর্থাৎ আমরা যারা প্রেসক্রিপ্শন লিখি বা আমরা যারা লেখাপড়া জানি—প্রত্যেকের এগুলোর ওপর প্রবল বিশ্বাস।

অতএব একটি প্রেসক্রিপ্শনে বেশী ওষুধ লেখার পিছনে একটি নয়, একাধিক কারণ রয়েছে। বিভিন্ন রকম প্রচারের মাধ্যমে, বাজারে প্রভাব বিস্তারের জন্য বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানীর নানা চেষ্টার নামে অপচেষ্টার ফলে জনসাধারণ থেকে শুরু করে চিকিৎসক সমাজ পর্যন্ত সকলেই বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়েন। বিভিন্ন ধরনের প্রলোভনের মাধ্যমে চিকিৎসকদের প্রেসক্রিপ্শন লেখায় উৎসাহিত করা, শিক্ষিত জনসাধারণ এবং প্রশাসনকেও প্রভাবিত করা এগুলোর অন্যতম।

আমাদের মত দরিদ্রতম দেশে যেখানে শতকরা ৮০ জন লোক প্রয়োজনের সময় ওষুধ পায় না, স্বাস্থ্য খাতে যেখানে অর্থ বরাদ্দও অতি সীমিত, সেখানে দেখা যায়, অপ্রয়োজনীয় এমনকি ক্ষতিকর ওষুধের ছড়াছড়ি। প্রেসক্রিপ্শনের মাধ্যমে এগুলো প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত হচ্ছে। দরিদ্র জনগণ অনেক সময় তাদের শেষ সম্বল বিক্রি করে উপশমের আশায় উক্ত অপ্রয়োজনীয়, এমনকি ক্ষতিকর ওষুধ ক্রয় করে নিজেদের স্বাস্থ্য-হানি করে সংকটের সম্মুখীন হয়।

সীমিত চিকিৎসকের মাধ্যমে প্রেসক্রিপ্শন সীমিতকরণ কিংবা ওষুধ বিক্রির ওপর

বিভিন্ন বাধা-নিষেধ আরোপ উন্নত দেশে যেভাবে করা হয়, তা বাংলাদেশে সম্ভব নয়। এখানে অশিক্ষিত কিংবা অর্ধশিক্ষিত চিকিৎসকদের উপর আমরা অত্যন্ত নির্ভরশীল। ন্যায় বা অন্যায়ভাবে, বৈজ্ঞানিক যুক্তি কিংবা যুক্তিহীনভাবে যে ওষুধ বাজারে প্রচলিত থাকে, তা তারা লিখবেই। লোকমুখে শুনে-শুনে অনেকে দোকান থেকে নিজেরাই কিনে এগুলো ব্যবহার করে। এসব অযৌক্তিক, অপ্রয়োজনীয়, এমনকি, ক্ষতিকর তথাকথিত ওষুধ থেকে রেহাই পাবার একমাত্র উপায় এমন একটা ব্যবস্থা যার ফলে এগুলোর অস্তিত্ব লোপ পাবে। মনে রাখতে হবে বাজার থেকে অদৃশ্য হলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। অস্তিত্ব লোপই একমাত্র উপায়। কারণ কালোবাজার আর কালোবাজারী পৃথিবীর প্রায় সব দেশে আছে। বাংলাদেশে তার ব্যতিক্রম নয়।

আইনের মাধ্যমে বিধি-নিষেধ প্রয়োগের ব্যাপারে চিকিৎসক সমাজের একটা নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে। এককালের অতি প্রিয় এবং পরিচিত কোরামিন এখন অদৃশ্য— প্রায়ই বিলুপ্ত। তরল কোরামিন ফোঁটা-ফোঁটা করে মুখে দিয়ে একটা মরণমুখী রুগীকে বাঁচাবার প্রয়াস এখন আর নেই। সকলে জানে এভাবে কোরামিনের কোন কার্যকারিতা নেই। যুক্তিসঙ্গতভাবে কোরামিন ব্যবহারের মোটামুটিভাবে একটি কারণ আছে। তা-ও ইন্‌জেকশনের মাধ্যমে। সচেতন চিকিৎসক সমাজ কোরামিনের ব্যবহার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়ে কোরামিনের প্রতি অহেতুক দয়ামায়া পরিত্যাগ করেছেন বলে এতো আদরের ওষুধটা এখন অনাদরের। অনাদরের বললে হয়ত-বা ভুল হবে। তবে নিঃসন্দেহে এর সীমাহীন বাজারের বহুল প্রচলন থেকে এখন সেটা তার আপন সীমায় বা গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ—সর্বরোগের স্থলে এখন একটি রোগেই শুধু এর ব্যবহার। তা-ও মুখে সেবন করে নয়। অযৌক্তিক এবং অবৈজ্ঞানিক ওষুধের বাজার থেকে বিলুপ্তি কেমন করে সম্ভব, কোরামিনের আপন গণ্ডিতে প্রত্যাবর্তন একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

মোটকথা আমরা যা লিখি, অন্যেরাও তাই লেখেন। কেউ লেখা থেকে আর কেউ-বা শোনা কথায় আমাদের সমর্থিত ওষুধকে সাদরে উপযোগী বলে গ্রহণ করে নেন। ক্ষতিকর ওষুধও এভাবে বাজারে বিস্তৃতি লাভ করে। এখানেই আমাদের দায়িত্ব।

একটা প্রেসক্রিপ্‌শনে একাধিক ওষুধ লেখার আগে একাধিকবার ভেবে দেখতে হবে, কেন এত ওষুধ?

সব অসুখে ওষুধ লাগে না

ব্যাধিগ্রস্থ অগণিত মানুষের রোগমুক্তির জন্য প্রতিদিন হাজার হাজার ব্যবস্থাপত্র লেখা হয়। উদ্দেশ্য রোগমুক্তি অথবা উপশম। যতদূর সম্ভব রোগমুক্তি সকলের কাম্য। যে রোগ দূরারোগ্য এবং যে-ব্যক্তি মৃত্যুর মুখোমুখি, যতটুকু সম্ভব তাদের কিছুটা কষ্টের লাঘব করা একটা নীতিগত ব্যাপার। এক কথায় ব্যবস্থাপত্রের প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য ব্যাধিগ্রস্থ লোকদের রোগ নিরাময়ে সাহায্য করা এবং সম্ভব না হলে কষ্ট লাঘব করা। এই উদ্দেশ্যকে সবসময় নীতি এবং মানগত দিক দিয়ে আমরা পালন করে আসছি।

একটা ব্যবস্থাপত্র লেখার ব্যাপারে চিকিৎসক, ওষুধ ব্যবসায়ী এবং রুগী-এই তিন পক্ষ সরাসরি অথবা কোন-না-কোনভাবে জড়িত। ব্যবসায় প্রসার লাভ করুক এটা প্রত্যেক ব্যবসায়ীরই কাম্য। আসলে কোন ওষুধ কি পরিমাণ তৈরী হবে তা নির্ধারণ করা হয় বাজারের চাহিদা অনুসারে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এগুলোকে সবসময় তারা বিচার করে দেখেন না। ফলে যেখানে হাজার হাজার অপ্রয়োজনীয় ওষুধ দিয়ে বাজার ভর্তি সেখানে জীবনরক্ষাকারী অনেক ওষুধই পাওয়া যায় না।

রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রায়ই প্রচার করা হয় জীবনরক্ষাকারী—ওষুধ কোন সহৃদয় ব্যক্তি দিতে পারলে —রোগীর জীবন রক্ষা করা যেতে পারে। এ-সমস্ত রহস্যের মূলে কে বা কারা দায়ী সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। বুদ্ধিমান ব্যবসায়ীমহল নিজেদের তৈরী বিভিন্ন ওষুধের চাহিদা বাড়াবার জন্যে যারা ব্যবস্থাপত্র লেখেন তাঁদের উপর প্রভাব বিস্তারের জন্য বিভিন্ন পথও তৈরী করে থাকেন। কাগজে আকর্ষণীয়ভাবে এমন সব তথাকথিত তথ্য তুলে ধরেন যা প্রাথমিক দৃষ্টিতে সত্য মনে হবে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে যারা পুরোন, অশিক্ষিত কিংবা অর্ধশিক্ষিত তারাই বেশী প্রভাবানিত হয়ে থাকেন। সুন্দর কাগজে বিভিন্ন রঙের লেবেল-এর উপর বিভিন্ন উপাদানের সুদীর্ঘ তালিকা সহজ-সরল জনগণের মনে নিঃসন্দেহে প্রভাব বিস্তার করে। কাজেই এটা অস্বাভাবিক হলেও সত্য যে অনেক ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপত্র লেখবার আগে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ শেষে এক বা একাধিক ওষুধ লেখবার জন্য রুগীরাই অনুরোধ জানান। যেমন ধরুন, রক্তের ওষুধ, হজমী ওষুধ, ঘুমের ওষুধ, মাথাব্যথার ওষুধ, স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর ওষুধ—ইত্যাদি।

পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্র দেশ—বাংলাদেশ। এই দেশেই ১৯৮১ সালে বিভিন্ন ধরনের এলোপ্যাথিক ওষুধের জন্য খরচ হয় ১৫৩ কোটি টাকা। আর বাজারজাত হয়

প্রায় চার হাজারের মত বিভিন্ন ধরনের ওষুধ। এগুলোর অধিকাংশই অপ্রয়োজনীয়, এমনকি কোন-কোন ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক। এমন এক দুঃখজনক পরিস্থিতিতে একটা জাতি বেশীদিন নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকতে পারে না। শুধু সরকারের ওপর দায়িত্ব দিয়ে নিজের গা-বাঁচিয়ে চলবে, এটাকে নৈতিক দিক দিয়ে সমর্থন দেওয়া যায় না। আমরা যারা ব্যবস্থাপত্র লিখি তাদের উদ্দেশ্য যদি রোগের উপশম হয়, তাহলে সেদিক দিয়ে আমরা কতটুকু ভুলের মধ্যে এখনও ডুবে আছি কয়েকটি দৃষ্টান্ত তা-ই-প্রমাণ করবে।

কিছুদিন আগে কোন একটা দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানের একজন পদস্থ কর্মচারী চিকিৎসার জন্য আমার সঙ্গে দেখা করেন। অনিদ্রা, বুক ধড়ফড় করা, বদ-হজমী, মাথা-ব্যথা, হাত পায়ে ঝিন্‌ঝিন্‌ করা, এগুলোই ছিল তাঁর প্রধান উপসর্গ। বিগত সাত-আট মাস ধরে একে একে চার-পাঁচ জন চিকিৎসকের পরামর্শ তিনি নেন। বিভিন্ন রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অনেক ব্যবস্থাপত্র তাকে দেওয়া হয়। ঘুমের বড়ি, হজমী টনিক, ভিটামিন ইন্‌জেকশন ইত্যাদি বিভিন্ন ওষুধ বিভিন্ন সময়ে দেওয়া হয়েছে। সব ওষুধের তালিকা একসাথে যোগ করলে প্রায় অর্ধশতকের কাছাকাছি হবে। অথচ রোগের উপশম হয়নি। রুগীর ভিড়ের মধ্যে আগাগোড়া রোগের ইতিহাস শোনা এবং পারিবারিক ও পারিপার্শিবক অবস্থার বিশদ বিশ্লেষণ করে দেখা কোনভাবেই সম্ভব নয় —এই ভেবে ভদ্রলোককে অনুরোধ জানালাম সমস্তকিছু নিজ হাতে লিখে, সে যত লম্বাই হোক, আমার সহকর্মীর নিকট একসময় রেখে যেতে। সপ্তাহখানেক পর আমার সাথে দ্বিতীয় বার সাক্ষাতের সময় ধার্য করা হল। তিনি নির্দেশানুযায়ী দুই এক দিনের মধ্যেই সমস্ত ইতিহাস এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ঘটনা লিখে অঙ্গীকার অনুসারে কাজ করলেন। এর মধ্যে তার ইতিহাস সম্পূর্ণ পড়ে নিয়ে যেখানে যেখানে দরকার লাল কালি দিয়ে চিহ্নিত করলাম। নির্ধারিত দিনে তিনি এলেন। রুগীর ইতিহাস পাশের ড্রয়ার থেকে তুলে নিয়ে তাকে দেখালাম। বললাম, তার কোন ওষুধের দরকার নেই। অফিসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে আপ্রাণ চেষ্টা করেও মতের মিল ঘটাতে না পারায় তার এইসব উপসর্গ দেখা দিয়েছে। ওষুধ ব্যবহারে এগুলোর উপশম হবে না। অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে, এমনকি, কিছুটা দুঃখজনক পরিস্থিতিকে সহ্য করে নিতে হবে, নিষ্ঠার সাথে কাজ করছি, এই মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মানসিক শান্তি হতে দৈহিক শান্তি আসবে। ট্যাবলেট কিংবা টনিক হতে কোনদিনও উপশম হবে না বরং অহেতুক অর্থব্যয়ে পারিবারিক অশান্তির সৃষ্টি হতে পারে। আমার এ সমস্ত বলার সাথে সাথে তার চেহারায় পরিবর্তন দেখতে পেলাম। কিছুক্ষণ আগেকার বিমর্ষ আশঙ্কাজড়িত ভদ্রলোকের চোখে মুখে হাসি ফুটে উঠল। অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আর ওষুধ ব্যবহার করবেন না এই অঙ্গীকার করে তিনি বিদায় নিলেন।

কোষ্ঠকাঠিন্য এমন একটি অবস্থা যা প্রায় সকলের কোন-না-কোন সময় চিন্তার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। অথচ কোষ্ঠকাঠিন্য কাকে বলে, বৈজ্ঞানিক দিক থেকে তাঁর সংজ্ঞা দেওয়া অত সহজ ব্যাপার নয়। সপ্তাহে একদিন করে পায়খানা হয় এমন লোক

যেমন আছে, তেমনি দিনে দুই-তিন বার করে পায়খানা হয় এমন লোকের সংখ্যাও কম নয়। প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে যেমন নিঃসন্দেহে কোষ্ঠকাঠিন্য রুগী বলা যাবে না, দ্বিতীয় ব্যক্তিকেও তেমনি কোষ্ঠকাঠিন্য নয় বলে চিহ্নিত করা যায় না। সোজা কোথায় কোষ্ঠকাঠিন্য অনেকটা ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করে।

অনেক সময় অনেক আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। লেখা থাকে 'সপ্তাহে একবার বিশেষ কোন একটা জোলাপ খেলে শরীরের সব বিষাক্ত জিনিস বের হয়ে যাবে। প্রত্যেক শনিবার রাত্রে একটি করে জোলাপ নিলে গোটা সপ্তাহ সতেজ থাকবেন।' এতে অনেকেই আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। সত্য বলে মেনে নিয়ে, সুন্দর বোতলে রাখা তেমন সস্তা নয় এমন একটা জোলাপের বোতল কিনে বাড়ীতে আনেন। প্রতি শনিবার নির্দেশমত খেতে থাকেন। এভাবে কয়েক সপ্তাহ যাওয়ার পর তিনি বলতে পারেন জোলাপের মাত্রা না বাড়ালে আগের মত আর সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। এছাড়া রবিবারে কয়েক বার পায়খানা হবার পর পরবর্তী কয়েকদিন আগে যে পরিমাণ পায়খানা হত তা হয়নি। এমনি করে জোলাপের পর পায়খানা, পায়খানার পর কোষ্ঠ-কাঠিন্য, কোষ্ঠকাঠিন্যের পর জোলাপ, এমনি একটা বিষচক্রের (Vicious Cycle) সৃষ্টি হয়। ফলে অহেতুক পয়সা খরচ হয়। স্বাভাবিক অভ্যাসগুলো নষ্ট হয়। শারীরিক দিক থেকে উপকারের চেয়ে অপকার বেশী হয়। মনে রাখতে হবে, জোলাপ কৃত্রিম উপায়ে সাময়িকভাবে পায়খানার পরিমাণ বৃদ্ধি করে, সাথে সাথে শরীরের কিছু-কিছু উপকারী উপাদানও অহেতুক বের হতে সাহায্য করে। দীর্ঘদিন জোলাপের ব্যবহার মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর হতে পারে। যেসব কারণে কোষ্ঠকাঠিন্যের সৃষ্টি হতে পারে তার মধ্যে কায়িক পরিশ্রমের অভাব, সামাজিক কিংবা ব্যক্তিগত কারণে নির্দিষ্ট সময়ে পায়খানার গতিবেগ প্রতিরোধ, স্বল্প পরিমাণ জল পান করা, খাবারের মধ্যে শাকসব্জী বা আঁশজাতীয় জিনিসের অভাব ইত্যাদি প্রধান। এই সমস্ত বিবেচনা না করে তাড়াহুড়োর মধ্য দিয়ে আমরা প্রেসক্রিপ্‌শন লিখি জোলাপের জন্য।

একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী তার সত্তর বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ পিতাকে নিয়ে কয়েকদিন আগে আমার পরামর্শের জন্য আসেন। তাঁর কথায় দুই বৎসর যাবত তাঁর পিতা অনিদ্রায় ভুগছেন। ডজন খানেক ব্যবস্থাপত্র বিভিন্ন চিকিৎসকের নিকট থেকে নেওয়া হয়েছে। এগুলোতে আছে ঘুমের বড়ি, সপ্তাহে দুই-একটা কোন-কোন ক্ষেত্রে একদিন পর পর ইন্‌জেকশন। তাছাড়া আছে বহুল প্রচলিত টনিক। পিতা-পুত্র দুজনেই একমত যে, নূতন ব্যবস্থাপত্র মতে ওষুধ ব্যবহারের প্রথম কিছুদিন কিংবা দুই-এক সপ্তাহ বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়, তারপরই অবস্থা আবার আগের মত হয়ে যায়। সমস্ত ঘটনা শুনে এবং ব্যবস্থাপত্র দেখে রুগীকে পরীক্ষা করে কোন রকম রোগ নির্ণয় করতে পারলাম না। তবে একটা সত্য বের হল : বৃদ্ধ পিতা দুপুরে আহারের পর প্রায় এক ঘণ্টা আর রাতে এগারোটা থেকে সাড়ে তিনটা পর্যন্ত ঘুমান। হিসাব করে দেখলাম প্রতিদিন তিনি পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ ঘন্টা ঘুমাচ্ছেন। এই বয়সে এটাই তার জন্য যথেষ্ট। তবে কেন এ অভিযোগ ? এটা বোঝা সহজ যে, শেষ রাতে সাড়ে তিনটার দিকে যখন তার ঘুম ভেঙে যায় চারিদিকে তখন নিঃঝুম অন্ধকার। বাড়ীতে

সকলেই তখন ঘুমে আচ্ছন্ন আর তিনি একা জেগে। এমন একটি পরিস্থিতিতে নিজেকে একটু ব্যতিক্রম মনে করা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আসলে এটা সত্যি নয়। তাঁর বয়সে যা পাওনা সে পরিমাণ ঘুম তিনি ঠিকই পাচ্ছেন। বাড়ীতে সমবয়সী আর একজন থাকলে নিজেকে তিনি এমন অবস্থায় অসহায় মনে করতেন না। এছাড়াও এতদিন কেউ তাকে হিসাব করে দেখাননি যে, তাঁর যা পাওনা, তা তিনি এখনও পাচ্ছেন। এটা তাঁকে ভালভাবে বুঝিয়ে দেবার পর তিনি অত্যন্ত আনন্দের সাথে এ সত্যকে মেনে নিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে জানতে পারলাম ওষুধ বন্ধ করার পর থেকে তিনি সম্পূর্ণ ভাল আছেন।

বাজারে বিভিন্ন নামে কত ধরনের ভিটামিন আছে তার হিসেব করা কঠিন ব্যাপার। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলো অপ্রয়োজনীয় ; এমনকি কোন-কোন ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক। ইতিপূর্বে পত্রিকান্তরে টনিক সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। সমস্ত বিষয় পুনরাবৃত্তি না করে দুই-একটা ভিটামিন সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন বলে মনে করি। ভিটামিন বি$_1$ এর ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বাংলাদেশে নেই বললে চলে। পার্নিশিয়াস এনিমিয়া (Pernicious anaemia) বলে যে রোগে এর ব্যবহার, তার অস্তিত্ব বাংলাদেশে এ পর্যন্ত একাধিক প্রমাণিত হয়নি।

পাকস্থলীতে (Stomach) ক্যান্সার হলে অপারেশন করে যদি সেটা সম্পূর্ণ ফেলে দেওয়া হয় তবে ইন্ট্রিনসিক ফেক্টর (Intrinsic factor) বলে একটা জিনিস যা পাকস্থলীতে তৈরী হয়, তা আর হতে পারে না। এর অভাবে ভিটামিন বি$_{12}$ শরীরে গৃহীত হত্তে পারে না। এমন একটা পরিস্থিতিতে ভিটামিন বি$_{12}$ ইন্‌জেকশন হিসেবে দেওয়া দরকার হত্তে পারে। তবে সেটাও তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ লিভারে যে পরিমাণ ভিটামিন বি$_{12}$ জমা থাকে, পাঁচ-ছ বছর শরীরের চাহিদা মেটাবার জন্য তা যথেষ্ট। এদিকে পাকস্থলীর ক্যান্সার রুগী অপারেশনের পর শতকরা দশজনের বেশী সেই সময়-সীমার উর্ধ্বে বাঁচে না।

ভিটামিন 'সি' একটা বহুল প্রচলিত ভিটামিন। ব্যবসায়ীরা কারসাজী করে বিভিন্ন রকমের ভিটামিন 'সি' তৈরী করে থাকে। একটা ট্যাবলেটে একশ থেকে পাঁচশ মিলিগ্রাম সংযুক্ত ভিটামিন 'সি' এমনভাবে প্রস্তুত করা হয় যা চুষে-চুষে লজেন্সের মত খাওয়া যায়। অথবা এক গ্লাস জলেতে ঢেলে সুস্বাদু সরবত হিসাবে পান করা যায়। এমন কি, অনেককে অতিথি আপ্যায়ন করতেও দেখেছি। ভিটামিন 'সি'-এর অভাব ঘটলে বিশেষ করে দাঁতের গোড়া থেকে রক্তপাত হতে পারে। পুষ্টিহীন শিশুদের বেলায় এটা দেখা যায়। ভিটামিন 'সি' এ-সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু লেবু, টমাটো, পেয়ারা, কমলা ইত্যাদিতে যে পরিমাণ ভিটামিন 'সি' পাওয়া যায় তাই যথেষ্ট। এককালে ধারণা ছিল, ভিটামিন 'সি' সেবন করলে সর্দি ভাল হয়। এ ধারণা শিক্ষিত সমাজেও দুর্ভাগ্যক্রমে বহুল প্রচলিত। বিশ্বাসের ভিত্তি সুদৃঢ় করবার জন্য ব্যবসায়ীরা একশ থেকে পাঁচশ মিলিগ্রামের বিভিন্ন পরিমাণ ভিটামিন 'সি' বাজারজাত করে। এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, ভিটামিন 'সি' সর্দি-কাশিতে কোন

কাজে লাগে না বরং দীর্ঘদিন ধরে বেশী পরিমাণে ভিটামিন 'সি' সেবন করলে মূত্রকোষে পাথর হতে পারে। এমনি আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেগুলো স্থানাভাবে বিশদভাবে আলোচনা সম্ভব নয়।

এ-পর্যন্ত যে আলোচনা করা হয়েছে, যে-সমস্ত দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে, তা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে ব্যবস্থাপত্রে ভরপুর দরিদ্র বাংলাদেশে অসংখ্য ব্যাধিগ্রস্থ মানুষ অসহায়ভাবে অযৌক্তিক ব্যবস্থাপত্রের শিকার হয়ে পড়ে। এতে তাদের মানসিক, শারীরিক এবং আর্থিক ক্ষতি হয়, এ জন্য দায়ী শুধু ব্যবসায়ীমহল নয়, যারা ব্যবস্থাপত্র লেখেন তারাও। মনে রাখতে হবে, চিকিৎসা যাতে জনসাধারণের কল্যাণে আসে সেটা চিকিৎসকের নৈতিক দায়িত্ব। সীমিত আর্থিক সঙ্গতির সঙ্গে অবৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপত্র একটি সামাজিক সংঘাত। এর প্রতিবিধান করা একটা জাতীয় কর্তব্য। তবু কেন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা দরিদ্র দেশবাসীকে তাড়াহুড়ো করে একটা ব্যবস্থাপত্র লিখে আস্বস্থ থাকি। অন্ততপক্ষে একটা ওষুধ লিখে না দিলে রুগী হয়তো মনে করবে যে ডাক্তার কিছু জানে না। নূতন নামের ওষুধ না দিলে, এ ডাক্তারের নূতন চিন্তা-ভাবনা নেই। বেশী দামের ওষুধ না দিলে সে ওষুধ উপকারী নয়। অনেকগুলো ওষুধ একসাথে দিলে অনেক উপকার হবে, এ-সব অযৌক্তিক মিথ্যা ধারণার বশে আমরা আর কতদিন নিজেদের আবদ্ধ রাখব? নিতান্ত অসহায়, অনেকাংশে নিরুপায় রুগীদের সমস্যাজর্জরিত না করে সংকটমুক্ত করে সেটা নীতিগত এবং জাতীয় অনুভূতির মাধ্যমে বিচার করতে হবে। রোগ থাকলে রোগের মূল উদ্ঘাটন না করে ব্যবস্থাপত্রের পর ব্যবস্থাপত্র লিখে সংকটের সৃষ্টি করা একটা অমার্জনীয় অপরাধ। স্বীকার করতে হবে রুগী এলেই ব্যবস্থাপত্র দিতে হবে এমন কোন কথা নেই। অসুখ হলেই ওষুধ লাগবে এমন কোন কথা নেই।

যদি ঘুম না হয়

আমরা সবাই ঘুমাই। এ-ঘুম সব সময় সবার জন্য সমান হয় না। কোন-কোন সময়ে কিছু না কিছু ব্যাঘাত ঘটেই। নানা কারণে যারা চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে আসেন, তাদের অনেকেরই অভিযোগ কম মাত্রায় ঘুম না অনিদ্রা। প্রাথমিক অন্যান্য অসুবিধা থাকলেও অনেকে এটাকেই প্রধান বলে ধরে নেন।

ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠকাঠিন্য এবং অনিদ্রা—এই তিনটি লক্ষণ অধিকাংশ বয়স্ক লোকের মুখে শোনা যায়। তারা ডাক্তারের পরামর্শ নিতে আসেন এগুলো প্রতিকারের উদ্দেশ্যে। আবার কিছু সংখ্যক মায়ের মুখে শোনা যায় যে তাদের নবজাত শিশুরা দিনভর ঘুমায়।

আসলে কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্কদের অনিদ্রা আর নবজাতকদের অতিনিদ্রা কোনটাই অস্বাভাবিক নয়। বয়সের সাথে ঘুমের মাত্রা এখানে ঠিকই আছে অন্তত চিকিৎসাশাস্ত্র অনুযায়ী। প্রকৃতপক্ষে একজন নবজাত শিশুর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় সব সময় ঘুমানো উচিত। আর ৭০/৮০ বয়সের একজন বৃদ্ধের প্রয়োজন মাত্র কয়েক ঘণ্টার ঘুম। আসলে অনিদ্রা কিম্বা অতিনিদ্রা কারও কাম্য নয়।

নিদ্রা-অনিদ্রা আমাদের স্বাভাবিক জীবন যাপনের সাথে যেহেতু ওতপ্রোতভাবে জড়িত, এর বিভিন্ন কারণ এবং প্রতিকার সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনা করা হবে।

জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে আপনি হয়ত-বা ইতিমধ্যেই এই নিদ্রা অনিদ্রার অনেক কারণ জানতে পেরেছেন। এই যেমন ধরুন অতি সুখের কিংবা দুঃখের ঘটনা, ব্যবসায়ে হিসাবের গরমিল, চাকুরীতে ঊর্ধ্বতন কিংবা সহকর্মীর সাথে ভুল বোঝাবুঝি, মাত্রাতিরিক্ত চা-কফি পান কিংবা অতি ভোজন প্রভৃতি যে কোন কারণই আমাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে।

আপনি যদি ব্যবসায়ী হন, আয়কর রিটার্ন দেওয়ার আগের কয়েকদিনের, এমন কি, সপ্তাহের কথা ভাবুন. ঘুমোতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।

ধরুন আপনি একজন অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব কিংবা কর্মকর্তা। আপনি বাজেট তৈরী কিংবা এর সাথে জড়িত রয়েছেন। দলিল তৈরীর আগের অবস্থাটা একবার ভেবে দেখেছেন কি ?

আবার ভাল কাজ করেও যদি কাউকে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার অহেতুক বকুনি খেতে হয়, তখন তার ঘুমতো দূরের কথা, খাবার রুচিও কমে যায়।

এবার নিজের কথা বলি। নিতান্ত প্রাণের টানে বছরে দুই-এক বার হলেও

গ্রামের বাড়ীতে যাই। সেখানে একরাত, কখনও পর পর দু-রাত কাটাই। শহর থেকে ভিন্ন পরিবেশে, বৈদ্যুতিক পাখা নেই, আরামদায়ক গদিও নেই। খাটের উপর পাটি কিংবা দুই-এক ইঞ্চির গদি। আশেপাশে লোকজনের ভীড়। এই স্বল্প সময়ে প্রত্যেকে চায় আমার কাছে তাদের নানা সমস্যার সমাধান। এই অবস্থায় রাত প্রায় বারটা কিংবা একটা পর্যন্ত বেজে যায়। তারপর লোকজনদের বিদায় দিয়ে বাতি নিভিয়ে ঘুমোতে যাই।

যখনি বাড়ী যাই ছোটবেলার সাথী মামাকে, যিনি গ্রামেই থাকেন, সব সময় সাথে রাখি। কারণ একা থাকতে আমার অস্বস্তি বোধ হয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। অথচ আমার মোটেই ঘুম আসে না। এত রাতে, এই বিছানায়, এরূপ পরিবেশে ঘুমোনো আমার অভ্যাস নয়। তাছাড়া গভীর রাতে গ্রামের অন্ধকারাছন্ন, নিঝুম নিস্তব্ধ পরিবেশ আমার কাছে রীতিমত অস্বস্তিকর।

আমার পাশের কামরায় থাকেন ভাবী তাঁর নাতি-নাতনীদের সাথে নিয়ে। এরা মাঝে-মাঝে কেঁদে ওঠে। ভাবী দরজা খুলে তাদের একের পর এক বাইরে নিয়ে যান প্রকৃতির প্রয়োজনে। কামরার মাঝখানে অসম্পূর্ণ দেয়ালটা ছাদ পর্যন্ত উঠানো হয়নি। পাশের কামরার টু-শব্দটি পর্যন্ত কানে ভেসে আসে। এতসব কাহিনীর বিস্তারিত বর্ণনা গ্রামের প্রতি আমার বিতৃষ্ণা বা অবহেলার নিদর্শন নয়। এই বর্ণনা দিয়েছি শুধু ঘুমের সাথে পরিবেশের যে নিগূঢ় সম্পর্ক তা তুলে ধরার উদ্দেশ্যে। আমি আর আমার সেই মামা একইসাথে ছোটবেলা থেকে বড় হয়েছি। বেশ কয়েক বৎসর কোলকাতা শহরে একই কামরায় একই সাথে থেকেছি, এক-দুই মাস নয় কয়েক বৎসর। জীবনের গতিধারার পরিবর্তনে বহুদিন পূর্বেই আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। উচ্চ শিক্ষিত হয়েও মামা এখনও গ্রামের বাসিন্দা। অধিকাংশ সময় তিনি গ্রামেই কাটান এবং মাঝে মাঝে শহরে গিয়ে ওকালতি করেন। শহরে থাকলে নাকি তার ঘুম হয় না। অথচ গ্রামে আমার পাশে অধিক রাতে বাতি নিভানোর সাথে-সাথে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন।

এই কাহিনী একটা বৈজ্ঞানিক সত্য প্রমাণ করে। আপনার শরীর, মন যে পরিবেশে অভ্যস্ত নয় কিংবা স্বস্তিবোধ করে না, সেখানে ঘুমের ব্যাঘাত হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

এই তো সে দিনের কথা। হঠাৎ আমার এক পুরনো বন্ধু রুগী হিসাবে আমার চেম্বারে এসে হাজির। তাঁর একমাত্র অভিযোগ ঘুমের ব্যাঘাত। কিছুদিন আগে কোন একটা বিশেষ কারণে সে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তারপর থেকে তার ঘুম হয় না। এইভাবে ক্রমান্বয়ে দুই তিন রাত নিদ্রাহীন অবস্থায় কাটাবার পর ঘুমোতে গেলেই যে অস্বস্তি বোধ করে চেষ্টা করলেও তার ঘুম আসে না এমন একটা ভ্রান্ত ধারণা তার মনে দানা বেঁধে উঠেছে। বিছানায় শুতে গেলেই তার নানা ধরণের লক্ষণ দেখা দেয়। সে অস্বস্তি বোধ করে। তার মাথা ভার-ভার লাগে, বুক ধড়ফড় করে ইত্যাদি।

নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখতে পেলাম, তার শারীরিক রোগ কিংবা অন্য

কোন রকম অসুবিধা নেই। অতীতেও তার বড় একটা ঘুমের ব্যাঘাত ছিল না। পারিবারিক জীবনেও সে মোটামুটি সুখী। তাই বন্ধু ও ডাক্তার হিসাবে একটু সময় নিয়ে তাকে সব বুঝিয়ে দিলাম। এই অনিদ্রা শারীরিক কোন অসুস্থতার কারণে হয়নি বরং উত্তেজনা থেকে অনিদ্রা, অনিদ্রা থেকে দুশ্চিন্তা. দুশ্চিন্তা থেকে অনিদ্রা। এই বিষচক্রই তার বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী। কয়েকটি উপদেশ দিলাম। সে আস্বস্ত হল। বেশ কিছু দিন পরে দেখা। আগের সেই সুন্দর চেহারা ফিরে এসেছে। কুশল জিজ্ঞাসা করলে সে হাসি মুখে বলল এখন সে সুস্থ নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে।

ঘুমের ব্যাপারে অনেকে প্রায়ই হিসেবের ভুল করে থাকেন। অনিদ্রা বলে যাকে বলে ব্যাখ্যা দেন, সেটা আসলে মোটেই অনিদ্রা নয়। কারণ আগেই বলেছি বয়স বাড়ার সাথে-সাথে ঘুমের চাহিদাও কমে যায়। একজন বয়স্ক লোকের ঘুমের চাহিদা একজন যুবকের চেয়ে অনেক কম। ৬০-এর উর্ধ্বে যাদের বয়স, চার পাঁচ ঘন্টার কাছাকাছি ঘুম তাদের জন্য যথেষ্ট। যেমন ধরুন, যদি কেউ রাত ১১টায় ঘুমিয়ে পড়েন আর রাত তিনটা-চারটায় তার ঘুম ভেঙ্গে যায়, এই পরিমাণ ঘুম তার জন্য যথেষ্ট। তবুও এরা দুঃখ করে বলেন 'অনেক ভোরে ঘুম ভেঙে যায়'। হিসাব মতে তিনি কিন্তু চার পাঁচ ঘন্টা ঘুমিয়েছেন। অথচ তিনি ঘুমের অভাব বোধ করেন। কারণ হয়ত তিনি হিসাব করে দেখেননি। দ্বিতীয়ত, তিনি যখন ঘুম থেকে জেগে উঠেন তিনি তার সমবয়সী কাউকেও তার মত নিদ্রাহীন অবস্থায় দেখেন না। বরং দেখেন অন্যরা ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন। তিনি দেখেন তিনিই একমাত্র জেগে আছেন। তার মত সমবয়সী সব লোক যদি একত্র করা যেত হিসাবের ব্যবধান তখন থাকতো না এবং তিনি নিজেকেও একা ভাবতেন না। অনিদ্রায় ভোগেন এই অভিযোগও তখন তার আর থাকত না।

প্রতিটি সৃষ্ট জীব একটা নিয়মের অধীন। এর ব্যতিক্রম হলেই কিছু-না-কিছু কুফল দেখা দেয়। জেগে থাকা এবং ঘুমানো মানুষের জীবনে নিয়ম থেকে অভ্যাসে পরিণত হয়। রাতেরবেলায় ঘুমানো একটা সাধারণ নিয়ম। আবার এমনও অনেকে আছেন যাদের দীর্ঘদিন ধরে সারারাত কাজ করতে হয়। বিশেষ করে যারা পালাক্রমে কাজ করেন। শুরুর দিকে কিছুটা অসুবিধা হলেও ক্রমান্বয়ে তাদের শরীর-মন ঘুমের নতুন সময়-নিয়মে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। পালাক্রমে সময়সূচী অনুযায়ী রাতে তাদের কাজ থাকলেও দিনে ঘুমানো এবং পরবর্তী পর্যায়ে দিনে কাজ থাকলেও রাতে ঘুমাতে কষ্ট হয় না। বরং তা একটা সাধারণ নিয়ম বা অভ্যাসে পরিণত হয়।

দিনেরবেলা ঘণ্টাখানেক ঘুমানো অনেকের অভ্যাস। কেউ যদি অলসতাবশত বা অন্য কোন কারণে দিনেরবেলা অনেকক্ষণ ঘুমান রাতেরবেলায় তার ঘুম কম হবেই। এই সময়ে হিসাব অনেকে মিলিয়ে দেখেন না। ফলে ঘুমের অভাব হয়েছে বলে দুশ্চিন্তায় পড়ে যান, এমন কি, মানসিক কষ্টে. ভোগেন। আগেই বলা হয়েছে মানসিক অশান্তি নিদ্রাহীনতার অন্যতম কারণ।

যদি কেউ নিদ্রাহীনতায় ভুগছেন বলে মনে করেন এবং পরামর্শ নিতে আসেন, তাহলে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে আসল ঘটনা জেনে নেয়া অপরিহার্য। যে-সব

কারণে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে পারে বলে আলোচনা করা হয়েছে তার একক বা একাধিক কারণ আছে কিনা জেনে নেয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে হিসাবের কোন গরমিল আছে কিনা দেখে নিতে হবে। ৬০/৭০ বৎসর বয়সে কেউ যদি চার-পাঁচ ঘণ্টা ঘুমানোর পরও বলেন যে তার ঘুম হয় না, সেটাকে ঘুমের ব্যাঘাত বলে ধরে না নিয়ে বরং তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে এই বয়সে এই পরিমাণ ঘুমই তার জন্য যথেষ্ট। দিনে এবং রাতে সবটুকু মিলিয়ে যে পরিমাণ ঘুম হয় এই সবটুকুর হিসাব একত্র করতে হবে। রাতেরবেলার ঘুমই শুধু ঘুম নয়, বরং দিনেরবেলার ঘুমও একই হিসাবের অন্তর্ভুক্ত তা বুঝিয়ে দিতে হবে।

এ-পর্যন্ত ঘুমের ওষুধ সম্বন্ধে একটি কথাও বলা হয়নি। না বলাই হয়ত ভাল। তাহলে কথাটা অজানা থাকবে বলে বলতে হচ্ছে। ওষুধ খেয়ে ঘুম আসলে ঘুম নয়, একটা কৃত্রিমতা, জোলাপ খেয়ে কোষ্ঠ পরিষ্কার করার মত। অভ্যাসে পরিণত হলে দিনে-দিনে জোলাপের মাত্রা যেমন বাড়াতে হয় ঘুমের ওষুধের মাত্রাও তেমনি বাড়াতে হয়। তাছাড়া মনে রাখতে হবে ঘুমের কোন ওষুধ নিরাপদ নয়। এগুলো কাছে না রাখাই ভাল। নির্ভরশীলতার পরিণামও ভাল নয়।

অনিদ্রা বা স্বল্প নিদ্রার কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এগুলো দূরীভূত করা সম্ভব। যদি বিভিন্ন রোগের একটা লক্ষণ হিসেবে এই উপসর্গ দেখা দেয় তবে তার প্রতিকার করতে হবে রোগ নিরাময়ের মাধ্যমে। যেমন ধরুন পেটে ব্যথা, কাশি ইত্যাদি কারণে যদি ঘুম না হয় তবে এইসমস্ত রোগের প্রতিবিধান করতে হবে। নচেৎ শুধু অনিদ্রার দিকে নজর দিয়ে আসল কারণ নিরূপণ করে তা দূরীভূত না করলে ঘুমের ব্যাঘাত থেকেই যাবে। শারীরিক সুস্থতা সত্ত্বেও ঘুম না হলে কারণ খুঁজে বের করতে হবে। এখানে কারণ দূরীভূত করা কঠিন কাজ নয়। কোন-কোন ক্ষেত্রে অবশ্য একথা খাটে না। যেমন ধরুন আপনি এমন একটা পরিবেশে পড়লেন যা থেকে আপনার রেহাই নেই, সে-ক্ষেত্রে আপনাকে যথাসম্ভব খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করতে হবে।

তবে কোন কোন ক্ষেত্রে দুশ্চিন্তা—অনিদ্রা—দুশ্চিন্তা এই বিষচক্র থেকে রেহাই পেতে হলে প্রথম কয়েকদিন কিছু ওষুধ খেতে হয়। এতে দুশ্চিন্তা কমে, চক্র ভাঙে। আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়, ঘুম আসে। মনে রাখতে হবে এ ওষুধ ব্যবহার শুধু স্বল্প সময়ের জন্য।

ওষুধ না খেয়ে কয়েকটা সহজ উপায়ে নিদ্রাহীনতার উপশম সম্ভব। যেমন বিকেল বেলায় খোলা জায়গায় হাঁটাহাঁটি, ব্যায়াম, শোবার সময় এক গ্লাস গরম জল কিংবা ভালভাবে হাত-মুখ ধুয়ে বিছানায় যাওয়া, হাতে কিছু-একটা নিয়ে শুয়ে শুয়ে পড়া, তছবী কিংবা মালা জপা, মৃদুস্বরে গান শোনা ইত্যাদি।

'যদি ঘুম না আসে'—এ ভাবনা ক্ষতিকর। অন্তত কিছুটা আরামদায়ক বা অভ্যস্ত পরিবেশে খোলা মন নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে গেলে প্রকৃতির আসল নিয়মে ঘুম আসবেই। মনে রাখতে হবে অনিদ্রার মূল উৎস চিন্তা ভাবনা, আর চিন্তা ভাবনা অনিদ্রার চেয়ে বেশী ক্ষতিকর।

হৃদরোগ : চিকিৎসকের দোষে

গ্রীক, ভাষায় ইয়াট্রোস অর্থ চিকিৎসক। অতএব ইয়াট্রোজেনিক হার্ট ডিজিস মানে দাঁড়ায় চিকিৎসকসৃষ্ট হৃদরোগ বা চিকিৎসাঘটিত হৃদরোগ।

হৃদরোগের জানা কারণসমূহের মধ্যে চিকিৎসাঘটিত কারণ গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত।

একজন চিকিৎসক কিভাবে একজন অহৃদরুগীকে হৃদরুগীতে পরিণত করার জন্য দায়ী হতে পারে সেটাই এখানে আলোচনা করা হবে। আচরণ, কথাবার্তা এবং কার্যকলাপের মাধ্যমে একজন চিকিৎসক কোন সুস্থ ব্যক্তির মধ্যে হৃদরোগের প্রাথমিক লক্ষণগুলো ফুটিয়ে তুলতে পারেন।

শিক্ষিত রুগী এবং চিকিৎসকের ঘাটতি না থাকা সত্ত্বেও উন্নত দেশগুলোতেও চিকিৎসাঘটিত হৃদরোগের বেশ ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের সমস্যা আরো অনেক প্রকট। আমাদের দেশে শতকরা মাত্র ২২ জন লোক সাক্ষর এবং নয় কোটি দেশবাসীর মধ্যে ডাক্তারের সংখ্যা মাত্র দশ হাজার। পল্লী এলাকায় শতকরা ৮৫ জন লোকের বাস অথচ মোট ডাক্তারের শতকরা ৯৫ ভাগেরও বেশী চিকিৎসক বাস করেন শহর ও নগরে। চিকিৎসক এবং জনসংখ্যার এই অস্বাভাবিক সংখ্যানুপাত এবং শিক্ষার মানের অসামঞ্জস্য থেকে আমরা নীচের সিদ্ধান্তগুলো নিতে পারি।

১. আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই অশিক্ষিত।

২. চিকিৎসক এবং জনসংখ্যার অনুপাত মোটেও উৎসাহজনক নয়।

৩. কম সুযোগ পাওয়া লোকেরা যথেষ্ট পরিমাণে চিকিৎসা সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

এই পরিস্থিতিতে দেশের অধিকাংশ মানুষই অসুখ-বিসুখে উপদেশ নেয়ার জন্য অশিক্ষিত হাতুড়ে চিকিৎসকদের শরণাপন্ন হয়। এই হাতুড়েদের সংখ্যা শহর বা নগরেও খুব একটা কম নয়।

গ্রামের সহজ-সরল মানুষের কাছে এরা ডাক্তার হিসেবেই পরিচিত। তারা সরল বিশ্বাসে এদের সাহায্য কামনা করে এবং তারা যা বলে তাই বিশ্বাস করে। অথচ এরা মনে করে পেটে কিছু হলেই তা 'গ্যাসট্রিক'। বুকে কিছু হলেই তা 'হৃদরোগ' এবং অস্থিসংযোগে ব্যথা (Joint) বাত ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

চিকিৎসা শিক্ষার কোন রকম সুযোগ-সুবিধা না পাওয়া সত্ত্বেও যারা এভাবে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর চিকিৎসক হিসেবে কাজ করেছেন তাদের প্রতি আমার যথেষ্ট

সহানুভূতি আছে। বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে (যেখানে শিক্ষার সুযোগ খুবই সীমিত এবং কখনো বা একেবারেই শূন্য) নাম মাত্র শিক্ষা গ্রহণ করে এদের কেউ-কেউ আবার আত্মসন্তুষ্টির জন্য নামের আগে ডাক্তার শব্দটি বসিয়ে দিয়ে দিব্যি চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছে।

সরল বিশ্বাসে এবং নিরাময়ের আশা নিয়ে বুকের ব্যথায় অস্বস্তি বোধ করছে এমন কোন রুগীকে যদি আপনি এদের কাছে নিয়ে যান, তবে দেখবেন, কিছু শোনার পর এবং দ্রুত পরীক্ষা করে রুগীর 'হার্ট খুব উইক' বা হার্টের অবস্থা খুবই খারাপ ইত্যাদি বলে হৃদরুগীর জন্য ব্যবহৃত ও প্রচলিত ওষুধগুলো ব্যবস্থাপত্রে লিখে দিয়েছেন। তাতে অসহায় রুগীর ভোগান্তি বাড়তে থাকে। হৃদরুগী হিসেবে নিজেকে বিবেচনা করে এবং ভুল নির্দেশ মতো ওষুধ সেবন করে চরম বিপদের দিকে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া তার আর কোন গত্যন্তর থাকে না।

এমন রোগ হলে রুগী বেশীদিন বাঁচে না—চিকিৎসকের কথা থেকে এ-ধরনের একটা ধারণা রুগীর মনে গেঁথে যায়।

পরবর্তী সময়ে শিক্ষিত কোন ডাক্তারের সাথে যদি পরামর্শ করার সুযোগ ঘটে (যা সচরাচর ঘটে না) তবে তিনি অনুসন্ধান করে রোগের আসল কারণ নির্ণয় করতে সক্ষম হলেও হতে পারেন। রোগের কারণ যদি দেখিয়ে দেয়ার মতো বা চিকিৎসাযোগ্য হয়, তবে রুগীকে তার ধারণা সংশোধন এবং সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য একমত করা যেতে পারে। কিন্তু রোগের কারণ যদি সহজে নির্ণয় করার মতো না হয় তাহলে সমস্যাটি আর সহজ থাকে না। এ-ক্ষেত্রে চিকিৎসক পরামর্শদাতার জ্ঞান, বিবেচনা এবং কার্যকলাপ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। 'হার্টের রোগও হতে পারে' বা 'হার্টটা তো দুর্বলই মনে হয়' চিকিৎসকের এ-ধরনের অসাবধান মন্তব্য রুগীর ভুল ধারণাকে আরো বেশী পোক্ত করে। হৃদরোগকেই রুগী তার একমাত্র রোগ হিসেবে মনে করে বসে থাকে।

অশিক্ষিত এবং অদক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীদের দ্বারা দেশের মানুষের যে ক্ষতি হচ্ছে সে-সম্পর্কে এতো কথা বলার পরেও শিক্ষিত চিকিৎসকদের দ্বারা সৃষ্ট সমস্যা সম্পর্কে কিছু না বলে পারছি না।

চিকিৎসাঘটিত হৃদরোগের একটা পূর্ণ তালিকা প্রণয়ন করা সম্ভব নয়। এখানে চিকিৎসকরা তাদের দৈনন্দিন কর্তব্য সম্পাদনে যে-সব সাধারণ রোগের সম্মুখীন হন তার দু-একটি সম্পর্কে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

নিম্ন রক্তচাপ (Low blood pressure)

সহজে অবসাদগ্রস্ততা অনেক রোগের একটি সাধারণ লক্ষণ হলেও মানসিক দুর্বলতা এ-ধরনের অবসাদগ্রস্থতার অন্যতম প্রধান কারণ। অথচ কারণ হিসেবে সাধারণভাবে নিম্ন রক্তচাপকেই দায়ী বলে মনে করা হয়। এই অবস্থায় একজন চিকিৎসক যদি রুগীর রক্তচাপ মেপে দেখেন যে স্বাভাবিক স্তরের নিচের দিকে তার রক্তচাপ রয়েছে এবং তাকে যদি বলে বসেন আপনি নিম্ন রক্তচাপে ভুগছেন তাহলে তার মনে সেটিই

স্থায়ীভাবে থেকে যাবে এবং এর থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ওষুধ ও উপদেশ চাইবে। পরিণতিতে সে লাভ করবে ভিটামিন বা টনিক গ্রহণের উপদেশসম্বলিত এক ব্যবস্থাপত্র, ভালো খাবার খেতেও তাকে বলা হবে। এই আক্কার দিনে সে খামোখা ভিটামিন এবং ভালো-দামী খাবারের পিছনে পয়সা খরচ করবে। অথচ অবসাদ ও অবসন্নতা দূর হবে না। অপর দিকে রুগীর ওজন বাড়বে, স্ফীত হবে তার শরীর, মেদবহুল হয়ে ক্রমশঃ সে একটা অথর্ব মানুষে পরিণত হবে।

এমন কিছু দৈহিক রোগ আছে যার কারণে নিম্ন রক্তচাপ হয়। সেই জন্য রুগীর শরীরে নিম্ন রক্তচাপ দেখা দিলে তার কারণগুলো খুঁজে বের করে সেগুলো দূর করার ব্যবস্থা নেয়া উচিত। চিকিৎসক যদি কারণ বাদ দিয়ে নিম্ন রক্তচাপের প্রতি মনযোগী হন তাহলে আন্দাজে ঢিল ছোঁড়াই হবে, ফল পাওয়া যাবে না। উদাহরণ স্বরূপ এ্যাডিসন'স ডিজিজের কথা বলা যায়। মূত্রগ্রন্থির উপরে অবস্থিত সুপ্রারেনাল গ্রন্থি অ্যাড্রিনোকরটিক্যাল হরমোন উৎপাদনে ব্যর্থ হলে যে শারীরিক অসুস্থতার সৃষ্টি হয় তাকে এ্যাডিসন'স ডিজিস বলে। এই রোগে আক্রান্ত হলে শরীরে যেসব উপসর্গ দেখা দেয় তার মধ্যে নিম্ন রক্তচাপ অন্যতম। এখন যদি কেউ ভাল-ভাল খাবার, নানা ধরনের টনিক ইত্যাদি দিয়ে রুগীর রক্তচাপের চিকিৎসা শুরু করেন, তাহলে রোগের আসল কারণটি অনুদ্ঘাটিত থেকে যাবে এবং কোন উন্নতির লক্ষণই দেখা যাবে না।

এটা নিশ্চিত করে বলা চলে যে শারীরিক নিম্ন রক্তচাপ অনেকের জন্ম থেকেই থাকতে পারে। এ ধরণের নিম্ন রক্তচাপ কোন রোগের কারণ নয় এবং এগুলোর কোন চিকিৎসারও প্রয়োজন নেই। বরং যাদের রক্তচাপ নিম্ন, বলতে হবে তারা ভাগ্যবান, কারণ তাদের উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি নেই। নিম্ন রক্তচাপ কোন কোন সময় কোন একটি মূল রোগের অংশ বিশেষ এবং এক্ষেত্রে এই মূল রোগগুলোর চিকিৎসা করা উচিত। ফলাফল নয় কারণের প্রতি লক্ষ্য রাখাটাই মূল কথা।

উচ্চ রক্তচাপ

ভুল রোগ নির্ণয়ের তালিকায় এটি আরেকটি সাধারণ ভুল। কোন রুগীকে রক্তচাপ পরিমাপক দিয়ে একবার মেপেই চূড়ান্তভাবে বলা উচিত নয় যে রুগী উচ্চ রক্তচাপে ভুগছে। এমন সিদ্ধান্তে আসার আগে রুগীর বয়সের কথা অবশ্যই ভাবতে হবে। প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে যাদের বয়স ৪০ বছরের কম তাদের ক্ষেত্রে গড়ে রক্তচাপের পরিমাণ ৯০ মিলিমিটার এবং ৫০ বছরের বেশী বয়স্কদের ক্ষেত্রে ১০০ মিলিমিটার পারদ-চাপ হয়ে থাকে। এটা ডায়াসটোলিক বা নীচের রক্ত চাপের মাত্রা। উপরের রক্তচাপ (সিস্টলিক) মোটামুটিভাবে মধ্যবয়স পর্যন্ত ১৫০ মিলিমিটার ধরা হয়। চিকিৎসকরা উচ্চ রক্তচাপের সন্ধান করতে গিয়ে বয়স্কদের ক্ষেত্রে প্রায়ই বয়সের কথা ভুলে যান। এর ফলে রুগীর মানসিক চিন্তা বেড়ে যায়। মূত্রবর্ধক রক্ত চাপ কমিয়ে আনার বিভিন্ন ওষুধ গ্রহণ করতে করতে শেষ পর্যন্ত স্ট্রোক বা পক্ষাঘাতের মতো দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে পারেন।

আমি অনেক তরুণকে, যাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে বলে সনাক্ত ও চিকিৎসা করা

হয়েছে, তাদের মধ্যে আমি নানা রোগের লক্ষণ ফুটে উঠতে দেখেছি। এমন তরুণদের উচ্চ রক্তচাপ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসার আগে কয়েকদিন পর বা একইদিনে দ্বিতীয় বার রক্তচাপ পরীক্ষা করলে দেখা যাবে উচ্চ রক্তচাপ স্বাভাবিক স্তরে চলে এসেছে কারণ এই বয়সে উচ্চ রক্তচাপ এত সাময়িক এবং আবেগপ্রসূত ব্যাপার যে তা দূর করার জন্য রক্তচাপ কমানোর ওষুধ খেতে হয় না।

এনজাইনা বা হৃদপিণ্ডজনিত বুকে ব্যথা

উচ্চ ও নিম্ন রক্তচাপের মত যে কোন কারণে বুকে ব্যথা বা শ্বাস কষ্ট হলেও অনেক সময় হৃদরোগ হয়েছে বলে মনে করা হয়। বুকের বাঁদিকে কোন ব্যথা হলে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত ধারণা করে বসেন হৃদপিণ্ডে নিশ্চয়ই কোন বিঘ্ন ঘটেছে। চিকিৎসকের উচিত এ সব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে ব্যথার সঠিক স্থান ও বৈশিষ্ট্য এবং হৃদ-রোগের সাথে জড়িত অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো সঠিকভাবে জেনে নেয়া।

দুটি বিশেষ অবস্থা যেমন: সারভিক্যাল স্পনডিলোসিস এবং হায়াটাস হার্নিয়া হৃদপিণ্ডের উপরের এলাকায় ব্যথা করতে পারে। গ্রীবাদেশীয় মেরুদণ্ড (Cervical Spine) পরীক্ষা করলেই সঠিক রোগ নির্ণয় করা সম্ভব। এ-ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে হায়াটাস হার্নিয়া হৃদপিণ্ডের উপরিস্থ এলাকায় ব্যথার সৃষ্টি করে। বৈশিষ্ট্য-গতভাবে এ ব্যথা সম্পূর্ণ দৈহিক অবস্থানের উপর নির্ভর করে (Postural) এবং ব্যথায় হাঁফ ধরে যাওয়ার (Exertion) সাথে এর সরাসরি কোন সম্পর্ক নেই।

এই দুই অবস্থার উপর গুরুত্ব না দেয়ার জন্য এবং সব বুকের ব্যথাকে হৃদপিণ্ডের ব্যথা বলে চালিয়ে দেয়ার প্রবণতার দরুণ হৃদরোগের সৃষ্টি হয়।

এইসব ক্ষেত্রে চিকিৎসকরা রক্তনালী প্রসারক হিসেবে যে সব ওষুধ ব্যবহার করেন তার দ্বারা (Coronary vasodilator) রুগীর কোন লাভ হয় না বরং হৃদরোগে আক্রান্ত হবার ধারণাই ধীরে ধীরে মনে গেঁথে যায়। এবং তার মধ্যে দুশ্চিন্তাসহ নানা রোগের উপসর্গ দেখা যায়। ক্রমশঃ সে বুকের মধ্যে হাঁফধরা ব্যথা এবং বিশ্রামে কিছুটা শান্তি অনুভব করে। ডাক্তারের তৎপরতা এবং সহকর্মী বন্ধু-বান্ধবের সাথে আলাপ-আলোচনা থেকে রুগী শ্বাসকষ্টের সাথে হাঁফ ধরার (Exertion) সম্পর্ক আবিষ্কার করে বসে এবং তার মনে তা পাকাপাকিভাবে বসে যায়।

ই. সি. জি.

নানা ধরনের হৃদরোগ নির্ণয়ে ই. সি. জি. একটি সর্বাধিক ব্যবহৃত পদ্ধতি, কিন্তু আমি বলব একটি সর্বাধিক অপব্যবহৃত পদ্ধতি। হৃদপিণ্ডের নানা অনিয়ম এবং হৃদপিণ্ডপেশীর পচন (Myocardial infarction) নির্ণয়ের জন্য ই. সি. জি. নিঃসন্দেহে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যাবশ্যক পদ্ধতি। ই. সি, জিতে পাওয়া ফলাফলের ভিত্তিতে রোগের সঠিক ব্যাখ্যা দেয়া কঠিন কিছু নয়। প্রত্যেক দায়িত্বশীল চিকিৎসকেরই এ-ব্যাপারে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা উচিত।

এসব মূল্যবান রোগ নির্ণায়ক যন্ত্রপাতি উপকারী হলেও নানা ধরনের বিপদ ঘটিয়ে থাকে। কোন-কোন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ সেকেলে এবং ভাঙ্গাচোরা ই. সি. জি. মেশিন

দিয়েই কাজ চালিয়ে থাকেন। ভেবে দেখা দরকার এ-ধরনের ভাঙ্গাচোরা ইলেকট্রো-কার্ডিয়োগ্রাম দিয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়া উচিত কিনা। ত্রুটিপূর্ণ কার্ডিওগ্রাম থেকে যে-সব রিপোর্ট আমাদের কাছে আসে তাতে লেখা থাকে 'সম্ভবত হৃদপিণ্ডপেশীর রক্তাভাব' (Myocardial ischaemia) অথবা 'সম্ভবত হৃদপিণ্ডপেশীর পুরোন পচন জনিত অবস্থা (Probably old myocardial infarction)'। এই ভুলের মাশুল কে দেবে? এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে, উচ্চপদে আসীন আমাদের অনেকে এ-সব ভাঙ্গাচোরা ই. সি. জি. মেশিনের ত্রুটিপূর্ণ রেকর্ডিং ও রিডিং-এর শিকার হয়েছেন। এমনকি, এদের মধ্যে কেউ কেউ কার্ডিয়াক সাইকোসিস-এ ভুগছেন। এখন এ-সব ভাঙ্গাচোরা মেশিন ব্যবহার নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়ন করার দিন এসেছে।

বর্তমানে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম মেশিন এবং তার ব্যাখ্যা সার্বজনীন ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে অপব্যবহার, ভুল ব্যাখ্যা এবং ভ্রান্ত নির্দেশ সাধারণ চিকিৎসকদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে এবং রুগীদেরই মাশুল দিতে হচ্ছে।

স্বাস্থ্যবান একহারা গড়নের তরুণের এস. টি. সেগমেন্টের (ST segment) উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধিকে হৃদপিণ্ডের বহিরাবরণের প্রদাহ (Pericarditis) হিসেবে ব্যাখ্যা করার ঘটনা যে সচরাচর ঘটে না এমন নয়। স্বাভাবিক সীমার মধ্যে এস. টি এবং টি. তরঙ্গের পরিবর্তনকে কখনো-কখনো 'রক্ত স্বল্পতাগত পরিবর্তন' বা 'সম্ভবতঃ হৃদপেশীর রক্তাভাব' বলে চালিয়ে দিতে দেখা যায়।

উপসংহারে বলব চিকিৎসকের কথা, প্রেসক্রিপশন ও কার্যাবলীর প্রভাবে অনেক হৃদরোগ জন্ম নিতে পারে। একজন সুস্থলোক নিজেকে হৃদরোগী মনে করে প্রতিনিয়ত চিন্তামগ্ন থাকতে পারে। কাজ কর্মছেড়ে দিয়ে সংসারে অশান্তির সৃষ্টি করতে পারে। ওষুধের খরচায় আর ডাক্তারের ফি-তে টাকা উজাড় করতে পারে। হার্ট বা হৃদপিণ্ড সম্বন্ধে প্রায় সকলে সজাগ। এ অঙ্গে কিছু হয়েছে শোনামাত্র সবাই আঁতকে উঠেন। চিকিৎসকের কিছু অসাবধানতা কিম্বা ত্রুটিপূর্ণ রোগ নির্ণয় যেখানে এমন পরিণতির সৃষ্টি করতে পারে সেখানে তাদের দায়িত্ব অপরিসীম।

এ তিন থেকে সাবধান

নানা কারণে হৃদপিণ্ডের অসুখ এবং পক্ষাঘাত (Stroke) হয়ে থাকে। আবার কতকগুলো কারণে এই ধরনের অসুখের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। যে-কয়টি কারণ এই প্রকোপ বৃদ্ধির মূলে সেগুলোকে এককভাবে 'বিপজ্জনক কারণ' (Risk factor) বলা যেতে পারে। উচ্চ রক্তচাপ কেলেস্টেরল আধিক্য এবং ধূমপান— তিনটি প্রধান 'রিস্‌ক্‌ ফেক্টর' বা ঝুঁকির কারণ। এই তিনটির যে কোন একটি থাকলে হৃদরোগ এবং 'স্ট্রোক'-এর মাত্রা দ্বিগুণ বেড়ে যায়। অন্যদিকে যদি দুটো কারণ একসাথে থাকে, বিপদের মাত্রা বাড়ে চারগুণ। আর তিনটি থাকলে বিপদের মাত্রা হয় আটগুণ। এবার তিনটি মুখ্য ঝুঁকির কারণ আলাদাভাবে আলোচনা করা যাক।

উচ্চ রক্তচাপ

যে সমস্ত কারণে হৃদপিণ্ড আক্রান্ত হয় কিংবা 'স্ট্রোক' হয় তার মধ্যে 'উচ্চরক্তচাপ' প্রথম এবং প্রধান। যদি একজন 'স্ট্রোক' রুগীর কারণ নির্ণয় করা হয় তাহলে দেখা যাবে তাদের মধ্যে কমপক্ষে শতকরা নব্বইজনেরই উচ্চরক্তচাপ আছে। অনেকে হয়ত মনে করে থাকেন উচ্চরক্তচাপ হলে বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পাবে, আসলে কিন্তু তা নয়। অনেক ক্ষেত্রে উচ্চরক্তচাপের কোন লক্ষণই থাকে না। জটিলতা না থাকলে ধরাও পড়ে না। সে-কারণে দেখা গেছে হৃদপিণ্ড আক্রান্ত হওয়ার পর উচ্চরক্তচাপ প্রথমবারের মত ধরা পড়েছে। এর আগে এ-বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা হয়নি। ঢাকা সচিবালয়ের সমস্ত লোকের রক্তচাপ জরীপ করে দেখা গেছে শিক্ষিত হলেও এদের অনেকেই জানত না তাদের রক্তচাপ আছে। জানত না বলেই অবশ্য চিকিৎসা করা হয়নি। অন্যদিকে অনেকে জেনে-শুনেও যেহেতু লক্ষণাদি ছিল না অথবা সামান্যতম লক্ষণ ছিল চিকিৎসায় গাফিলতি করেছে। হয়ত অনিয়মিতভাবে চিকিৎসা করেছে, অথবা একেবারেই করেনি। উভয় ক্ষেত্রেই রক্তচাপের যে প্রতিক্রিয়া শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে হয়ে থাকে, তা হতেই থাকে। মস্তিষ্কে, হৃদপিণ্ডে, বৃক্কের (Kidney) এবং শরীরের বিভিন্ন ধমনীর কর্মকাণ্ডে জটিলতার সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে সীমিত রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে।

অনেকে মনে করতে পারে উচ্চরক্তচাপের কারণ বের করে তা নির্মূল করাই উত্তম। আসলে কিন্তু তা নয়। যদি একশ জন উচ্চ রক্তচাপের রুগীর বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান হয় তাহলে দেখা যাবে মাত্র পাঁচ জনের প্রাথমিক কারণ জানা যায়।

অর্থাৎ শতকরা পঁচানব্বই জনের কোন কারণ জানা যায় না। সেই জন্য এগুলোকে 'এসেন্সিয়াল হাইপারটেন্শন' ('Essential Hypertension') নামে অভিহিত করা হয়। অনেকে ন্যায়সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন তুলেছে, এই পাঁচজন রুগীর প্রাথমিক কারণ নির্ণয়ের জন্য উন্নয়নশীল দরিদ্র দেশে অযথা ব্যয়বহুল পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো আদৌ উচিত কি-না। শুধু প্রস্রাব পরীক্ষা করে বৃক্কজনিত কোন দোষ আছে কিনা সাধারণত ধরা যায়, এবং জানা কারণগুলোর মধ্যে এটা অন্যতম প্রধান। এ ছাড়া শারীরিক পরীক্ষা (Physical examination) করে কিছু কারণ ধরা যেতে পারে। সূক্ষ্ম পরীক্ষা ব্যয়বহুল, অথচ তেমন কাজে লাগে না।

কোন একটা রুগীর রক্তচাপ ধরা পড়লেই ধরে নিতে হবে তার চিকিৎসা নিতান্ত প্রয়োজন। এ-চিকিৎসা দু-এক দিনের বা দু-এক মাসের জন্য নয়;—সব সময়ের জন্য। বর্তমানে রক্তচাপ চিকিৎসায় যে ওষুধ পাওয়া যায় তাকে সমুচিতভাবে ব্যবহার করলে রক্তচাপ আয়ত্তে আনা সম্ভব। মনে রাখতে হবে, রক্তচাপ যখন আয়ত্তে আনা হয়, শরীরের ওপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়াও বন্ধ হয়। অন্যদিকে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিলেও চিকিৎসার ফলে সেগুলো আয়ত্তে আনা যায়, প্রশমিত হয়, এমন কি লোপ পেতেও পারে। উচ্চ রক্তচাপের কারণ জানা না থাকলেও কয়েকটি কারণে উচ্চ রক্তচাপের প্রভাব দেখা যায়। যেমন পরিবারে একজনের উচ্চ রক্তচাপ থাকলে অন্যদের থাকার সম্ভাবনা থাকে। উচ্চ রক্তচাপ অনেক সময় পারিবারিক ব্যাধি হিসাবে দেখা যায়।

খাদ্যদ্রব্যে লবণের পরিমাণের সাথে উচ্চ রক্তচাপের সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশে খুলনা অঞ্চলের লোকদের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপের প্রকোপ বেশী বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। জাপান এবং কোরিয়ার খাদ্যদ্রব্যে লবণের পরিমাণ বেশী, এছাড়া দক্ষিণ ইরানে যারা বেশী মাত্রায় লবণ ব্যবহার করে—তাদের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপের প্রকোপ বেশী দেখা গেছে। অন্যদিকে মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোতে লবণ খুব কম পরিমাণে ব্যবহার করা হয় বলে রক্তচাপের প্রকোপ এই সমস্ত দেশগুলোতে অনেক কম।

কোলেস্টেরল

রক্তে এই চর্বিজাতীয় পদার্থের পরিমাণ বেশী হলে ধমনীর গায়ে এটা জমা হয়। ফলে ধমনীর আভ্যন্তরীণ ব্যাসের পরিমাণ এবং সম্প্রসারণ ক্ষমতা লোপ পায় এবং রক্ত সঞ্চালন বিঘ্নিত হয়। বিভিন্ন প্রকারের চর্বিজাতীয় পদার্থ শরীরের রক্তে প্রবাহিত হয়। এদের অনেক নাম থাকলেও শিক্ষিত মহলের কাছে 'কোলেস্টেরল' (এঁদের মধ্যে প্রধান) মোটামুটি ভাবে একটা পরিচিত নাম।

নানা প্রকারের হরমোন উৎপাদনে কোলেস্টেরল অপরিহার্য। কোলেস্টেরল শুধু খাদ্যদ্রব্যের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে না, যকৃতেও এটা তৈরী হতে পারে। 'ট্রাইগ্লিসারাইড', 'ফসফোলিপিড, প্রভৃতি চর্বিজাতীয় পদার্থ কোলেস্টেরলের মতই ক্ষতি সাধন করতে পারে। রক্তে এইসব চর্বিজাতীয় জিনিসকে দ্রবীভূত হওয়ার জন্য প্রোটিন বা আমিষের সাথে সংযুক্ত হতে হয়। এই সংযুক্তির ফলে যে পদার্থের সৃষ্টি হয় তার

নাম 'লাইপোপ্রোটিন'। নানা প্রকার লাইপোপ্রোটিন রক্তে পাওয়া যায়। এগুলোকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়: যেমন অল্প ঘনত্ববিশিষ্ট লাইপোপ্রোটিন (LDL—এতে প্রধানত কোলেস্টেরল রয়েছে) এবং উচ্চ ঘনত্ববিশিষ্ট লাইপোপ্রোটিন (HDL)।

কোলেস্টেরলসমৃদ্ধ এই অল্প ঘনত্ববিশিষ্ট লাইপোপ্রোটিনের আধিক্য ধমনীর গায়ে দ্রুত মাত্রায় তৈলাক্ত পদার্থ জমতে সাহায্য করে। কাজেই যাদের শরীরে এর পরিমাণ বেশী তাদের হৃদরোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশী, এমন কি, তুলনামূলকভাবে অল্প বয়সেও। উচ্চ ঘনত্ব বিশিষ্ট লাইপোপ্রোটিনের বেলায় ঘটে এর উল্টোটা। এটা বরং ধমনীর গায়ে চর্বি জমার প্রতিবন্ধক এবং এটা শরীরে কোলেস্টরলের মাত্রা কমায়।

শরীরে কোলেস্টেরলের আধিক্য প্রধানত দুটো কারণে হয়ে থাকে। একটা বংশগত অপরটা জন্মের পর বিভিন্ন বিপাকজনিত রোগের কারণে। এ-সমস্ত রোগের মধ্যে রয়েছে বহুমূত্র, থাইরয়েড হরমোনের স্বল্পতা, নেফ্রোটিক সিনড্রোম ইত্যাদি। পরিশ্রমবিমুখ, মেদবহুল ব্যক্তি, মদ্যপায়ী, অতিমাত্রায় চর্বিজাতীয় খাদ্যগ্রহণকারীদের শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশী থাকে। পক্ষান্তরে যারা শারীরিক পরিশ্রম করে, পরিমিত খাবার গ্রহণ করে এবং উক্ত বিপাকজনিত রোগে আক্রান্ত নয়, তাদের শরীরে উচ্চ ঘনত্ববিশিষ্ট লাইপোপ্রোটিনের মাত্রা তুলনামূলকভাবে বেশী থাকে। তাই যাদের শরীরে কোলেস্টরলের মাত্রা বেশী তাদের সাবধান হতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে চিকিৎসা করাতে হবে।

চিকিৎসার মধ্যে রয়েছে কোন বিপাকজনিত রোগ থাকলে তাঁর চিকিৎসা করা, মাত্রাতিরিক্ত চর্বিজাতীয় খাদ্য বর্জন ও শারীরিক পরিশ্রম করা। কোলেস্টেরল কমানোর জন্য বিভিন্ন সময়ে নানা ওষুধের উপকারিতা দাবী করা হলেও এ-পর্যন্ত এমন কোন ওষুধ নেই বললেই চলে। কোলেস্টেরল কম পরিমাণে আছে এরকম খাবার গ্রহণ করাই উত্তম এবং এটাই কোলেস্টেরল কমানোর মহৌষধ। সম্পৃক্ত চর্বি (Saturated fat) শরীরে কোলেস্টেরল বৃদ্ধির সহায়ক। তাই সম্পৃক্ত চর্বিসমৃদ্ধ খাবারের পরিবর্তে অসম্পৃক্ত চর্বি (Poly unsaturated fat) গ্রহণ করা কিছুদিন আগে পর্যন্ত প্রাধান্য পেলেও বর্তমানে বিজ্ঞানীরা মনে করেন এটা অধিক পরিমাণে ব্যবহার যুক্তিযুক্ত নয়। অসম্পৃক্ত চর্বি শস্যজাতীয় উপাদান যেমন সয়াবিন, তুলা বীজ, সূর্যমুখী বীজ, ভুট্টা প্রভৃতি থেকে পাওয়া যায়। আর সম্পৃক্ত চর্বি পাওয়া যায় প্রধানত প্রাণীজ খাবার থেকে। সাধারণভাবে বলতে গেলে যে সব খাবার মাত্রায় বেশী গ্রহণ করা উচিত নয় সেগুলো হচ্ছে চর্বিযুক্ত মাংস, ডিমের কুসুম, মাখন, পনির, ঘি, পূর্ণমাত্রার দুধ (Full cream milk), ডালডা এবং এই সকল উপাদানে তৈরী খাবার।

ধূমপান

ধূমপানের কিছুটা দিক অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে। হৃদপিণ্ডের উপর এর বিশেষ প্রভাব এখানে বলা প্রয়োজন। কারণ আগেই বলা হয়েছে তিনটি প্রধান 'রিস্ক ফেক্টর'-এর মধ্যে এটা অন্যতম।

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে অধূমপায়ীদের তুলনায়

তিনগুণ। একবার আক্রান্ত হওয়ার পরও কেউ যদি ধূমপান থেকে বিরত না হয়, তার দ্বিতীয় বার হৃদপিণ্ড আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

এর আগে কোলেস্টেরল-এর মাধ্যমে ধমনীতে যে পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে ধূমপানের ফলে তা বহুলাংশে বেড়ে যায়। কেউ-কেউ ফিল্টারযুক্ত দামী বিদেশী সিগারেট পান করে আত্মতৃপ্তি লাভ করে, এবং মনে করে এতে বিপদ কম। এটা ভুল ধারণা। এর পেছনে কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই।

একটা সিগারেটের ধোঁয়া শত শত বিষাক্ত পদার্থের সংমিশ্রণ। যেমন নিকোটিন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, এমোনিয়া, সায়ানাইড, নাইট্রোবেন্জিন, ফিনল ইত্যাদি ইত্যাদি। আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি একটা সমীক্ষা চালিয়ে দেখিয়েছে যে ধূমপায়ী ৪৫ থেকে ৫৫ বৎসরের মহিলাদের হৃদপিণ্ডের পীড়া এবং স্ট্রোক তাদের সমবয়সী অধূমপায়ীদের তুলনায় দ্বিগুণ। কেউ যদি ধূমপায়ী হয় এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি ব্যবহার করে, তাহলে তাদের হৃদপিণ্ড আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা অন্যদের তুলনায় দশগুণ বেড়ে যায়। ত্রিশ থেকে তেতাল্লিশ বৎসর বয়স্ক মহিলাদের বেলায় আমাদের দেশে এই ধূমপান যে কত বিপজ্জনক তা সহজেই অনুমান করা যায়। জন্ম নিয়ন্ত্রণ বটিকা এদেশে প্রচুর ব্যবহৃত হয়। তার উপর যদি কারো ঘাড়ে ধূমপানের বদ অভ্যাস চাপে, তাহলে বিপদের আর সীমা থাকে না।

অনেকে মনে করে থাকে আমাদের দেশে ধূমপান মেয়েদের মধ্যে তেমন প্রচলিত নয়। গ্রামের মেয়েদের বেলায় এটা খাটে না। এদিকে শহরে অনেক আধুনিকার হাতে সিগারেট শোভা পায়।

একটুখানি হিসাব করলেই দেখা যাবে ধূমপানের বদ অভ্যাস বন্ধু-বান্ধবদের পাল্লায় পড়ে ছোটবেলা থেকেই শুরু হয়। কোন-কোন ক্ষেত্রে বয়ঃজ্যেষ্ঠদের অনুসরণের মাধ্যমে ধূমপানের হাতেখড়ি হয়। গ্রামীণ কর্মজীবী মহিলা ও পুরুষ অপুষ্ট শরীরে হাড়ভাঙা খাটুনিতে অল্পে পরিশ্রান্ত হয়ে যায়। আর এই ক্লান্তি দূরের উদ্দেশ্যে ধূমপানকে একমাত্র সম্বল হিসাবে বেছে নেয়। ফলে ক্ষতি হয় নিজের এবং তাদের সান্নিধ্যে আসা আর সকলের—যদিও তারা অধূমপায়ী।

বাংলাদেশে জন্মানোর পর একটি শিশুর গড় আয়ু ৪৭ বৎসর। এদেশে এখনও অধিকাংশ শিশু ধূমপানের বয়স হবার আগেই মারা যায়। বাংলাদেশের মহিলাদের মধ্যে ধূমপানের কারণেই অনেক শিশু প্রাণ হারায় বলে এক স্বাস্থ্য রিপোর্ট জানা গেছে। হৃদরোগ ছাড়াও ফুসফুস, মুখগহ্বর ও কন্ঠনালীর ক্যান্সার, ক্রনিক ব্রংকাইটিস্, যক্ষা, বার্জার্স ডিজিস (যাতে প্রধানত পায়ে রক্ত সঞ্চালন কমে গিয়ে পচন ধরতে পারে), নবজাতকের ওজন-স্বল্পতা প্রভৃতি রোগের একটি মৌলিক কারণ ধূমপান।

অপুষ্টি এবং সংক্রামক রোগে এদেশে এখনও প্রচুর মৃত্যু ঘটে বলে হৃদরোগের হার এদেশে তুলনামূলকভাবে কম। তবে ঐ সমস্ত রোগ প্রতিহত করার সঙ্গে-সঙ্গে ধূমপান প্রতিহত করতে না পারলে হৃদরোগ এদেশে ভয়াবহ রূপ নেবে ; যা বর্তমানে সভ্য দেশগুলোতে মৃত্যুর প্রধান কারণ হিসাবে পরিগণিত। এরই প্রতিধ্বনি করে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বলেছেন 'শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য সবচেয়ে মারাত্মক যে অস্ত্রটি মানুষ আবিষ্কার করেছে—তা হচ্ছে ধূমপান'।

যে দুটো ক্যান্সার প্রতিরোধ সম্ভব

ক্রেব বা কাঁকড়া থেকে ক্যান্সার শব্দের উৎপত্তি। এটা একটা দুর্ভাগ্যজনক ব্যাধি। কাঁকড়ার পা যেমন তার শরীর থেকে চারদিকে বিস্তৃতি লাভ করে, ক্যান্সার রোগ আবির্ভাব-স্থল থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে বলে একে কাঁকড়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, শরীরের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরাসরিভাবে এবং রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে এ রোগ বিস্তৃতি লাভ করতে পারে। অতএব, এ রোগের ভয়াবহতা সহজেই অনুমান করা যায়। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে এ রোগের চিকিৎসা এখনও আমাদের আওতার বাইরে। বিশেষভাবে যে দুটো ক্যান্সার সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করব, সেগুলো একেবারে যদি শুরুতেই ধরা না পড়ে তা হলে নিরাময় সম্ভব হয়ে উঠে না। বিশ্বজুড়ে যে দুটো ক্যান্সারের বিস্তৃতি এখন স্বীকৃত তার একটি ফুসফুসের অন্যটি লিভার বা যকৃতের। তবে ফুসফুস এবং লিভার-ক্যান্সারের কারণ এখন আর অজানা নয়। মূলতঃ এদের একটি হয় ধূমপানে, অন্যটি ভাইরাসজনিত কারণে।

ধূমপানের সাথে ফুসফুসের ক্যান্সারের সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রথম তথ্য প্রকাশিত হয় প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে। এ তথ্য বিভিন্ন সময়ে শুধু সমালোচিত হয়নি, অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। কখনও বলা হয়েছে, এ তথ্য কল্পনাপ্রসূত, আবার কখনও বলা হয়েছে এটা হিসাবের হেরফের। বিজ্ঞানীরা এতে নিরুৎসাহিত না হয়ে প্রচুর উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে দেশ-বিদেশে গবেষণা চালিয়ে যান। আজকের দুনিয়ায় ধূমপান জনিত ক্যান্সার একটা সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য। এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এককালে ধূমপানজনিত ক্যান্সার শুধু ফুসফুসে সীমাবদ্ধ থাকে বলে ধারণা করা হত। এখন আমরা জানি শুধু ফুসফুস নয় শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গেও এ ক্যান্সার দেখা দিতে পারে। যেমন মুখগহ্বর থেকে শুরু করে মূত্রাশয়ে পর্যন্ত ধূমপানের ফলে ক্যান্সার দেখা দিতে পারে। কেউ কেউ মনে করতে পারেন ধূমপানের সময় সিগারেটের ধোঁয়া নিঃশ্বাসের সাথে ফুসফুসে প্রবেশ করে বলে সেখানে ক্যান্সার হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু কি করে এ ক্যান্সার শরীরের অন্যান্য স্থানে হতে পারে এ প্রশ্নের জবাব আপাতদৃষ্টিতে কঠিন মনে হলেও আসলে কিন্তু সহজ। ধূমপানের বিষাক্ত পদার্থ রক্তে সঞ্চালিত হয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। সে কারণে হৃদপিণ্ডে এবং শিরা উপশিরায় নানা ধরনের বিষক্রিয়া দেখা দেয়। যেহেতু ক্যান্সার আমাদের আলোচ্য বিষয়, ধূমপানের বিষক্রিয়া সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা এখানে সমীচীন নয়।

বাংলাদেশে ধূমপানজনিত ক্যান্সারে কত লোক প্রতি বছর মৃত্যুবরণ করে তার হিসাব দেয়া সম্ভব নয়। চিকিৎসক এবং অনেক সমাজকর্মী তাদের অভিজ্ঞতা থেকে

স্বীকার করবেন যে ফুসফুসের ক্যান্সার দিন দিন বেড়ে চলেছে। নিকটবর্তী দেশ ভারতবর্ষ থেকে শুরু করে পূর্ব-পশ্চিম যে দিকেই যাই না কেন, ধূমপানজনিত ক্যান্সারের প্রভাব বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জরিপ করা হয়েছে। কোন একটা দেশ, যেমন আমেরিকার কথাই ধরা যাক। ১৯৫০ সালে আমেরিকায় ফুসফুসের ক্যান্সারজনিত মৃত্যুর হার ছিল ১৮,৩১৩। ১৯৭৭ সালে সেটা গিয়ে দাঁড়ায় ৯০,৮২৮-এ। আমেরিকান ক্যান্সার সমিতি ১৯৮২ সালের হিসাবে উল্লেখ করেন ১,১১,০০০ লোক ফুসফুসের ক্যান্সারজনিত রোগে মারা যায়।

ধূমপান নিঃসন্দেহে ফুসফুসের ক্যান্সারের অন্যতম প্রধান কারণ। কোন কোন হিসাবে দেখা যায় শতকরা ৮০ ভাগ ফুসফুসের ক্যান্সারের জন্য ধূমপানই দায়ী। যারা দৈনিক ২০-৪০টা সিগারেট খান, ফুসফুসের ক্যান্সারে তাঁদের মৃত্যুর সম্ভাবনা অধূমপায়ীদের তুলনায় ২০-২৫ গুণ বেশী।

পশ্চিমা দেশগুলোতে মেয়েদের মধ্যে ধূমপানের প্রকোপ বেড়ে যাবার ফলে ফুসফুসের ক্যান্সারের সংখ্যা বেড়ে গেছে। এককালে এসব দেশে স্তনে ক্যান্সারের প্রকোপ ছিল বেশী। ১৯৮০ সালে মেয়েদের মধ্যে ফুসফুসের ক্যান্সার স্তনের ক্যান্সারকে হার মানিয়েছে। এটা ধূমপানেরই পরিণাম। অন্যদিকে বৃটেনের চিকিৎসকদের দিকে নজর দেয়া যাক। বিগত দশকে বৃটেনের চিকিৎসক সমাজ বহুল পরিমাণে ধূমপানের বদ অভ্যাস পরিহার করেন। ফলে তাঁদের মধ্যে ফুসফুসের ক্যান্সারের প্রকোপ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।

পরিবেশের উপর ধূমপানের কুফল কিছুদিন আগে পর্যন্ত সামান্য কিছু শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। যেমন চোখ জ্বালা, নাক এবং গলায় কিছু কিছু অস্বস্তিভাব। অথচ এগুলোর জন্য ধূমপায়ীরা কোন সময় নিজেদের অপরাধী মনে করতেন না। কারণ ধূমপান পরিবেশকে দূষিত করে এটা ছিল তাঁদের ধারণার বাইরে।

সম্প্রতি ঐচ্ছিক বা প্রত্যক্ষ ধূমপায়ী এবং অনৈচ্ছিক বা পরোক্ষ ধূমপায়ী সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা গেছে। যারা ধূমপান করেন না অথচ ধূমপানের দূষিত পরিবেশে থাকেন, তাদেরকে অনৈচ্ছিক বা পরোক্ষ ধূমপায়ী বলা হয়। অনৈচ্ছিক বা পরোক্ষ ধূমপায়ী কতটুকু বিপদগ্রস্ত হবেন তা নির্ভর করে পারিপার্শিবক পরিবেশের উপর। যেমন আবাসিক পরিবেশেও ধূমপানের কুফল পরিলক্ষিত হয়। ধূমপায়ী মাতা-পিতার শিশুদের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত নানা রোগের প্রকোপ জন্মের প্রথম বছরে অত্যধিক পরিলক্ষিত হয়।

গর্ভাবস্থায় ধূমপান জরায়ুর পরিবেশ দূষিত করে। ফলে নবজাতকের ওজন তুলনামূলকভাবে কম হয়। এমনকি জন্মের কিছুদিনের মধ্যে এসব শিশুর মৃত্যুর হারও অনেক বেশী। আমাদের সমাজে ধূমপায়ীদের সংখ্যা নগণ্য নয় এবং স্বল্প পরিসর স্থানে অনেক লোক বসবাস করে। ফলে পরিবেশজনিত ধূমপানের বিপদ তুলনামূলকভাবে বেশী।

যে ধূমপান এমন একটা মারাত্মক পরিণতির সৃষ্টি করতে পারে তা নিঃসন্দেহে বিষপানের সামিল। স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, এর থেকে নিষ্কৃতির উপায় কি? এ মহাবিপদ থেকে পরিত্রাণের উপায় এ বদভ্যাস ত্যাগ করা। এর সুফল প্রমাণিত। একটু আগেই বৃটেনের চিকিৎসক সমাজের উপর ধূমপানের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য থেকে জানা গেছে, ধূমপান বন্ধ করার পর ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা সময়ের ব্যবধান কমতে কমতে দশ-বার বছর নাগাদ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়।

দ্বিতীয় ধরনের ক্যান্সার এককালে আমাদের দেশে প্রায় অজানা ছিল। কারণ হয়ত একে সত্যিকারভাবে আমরা তখন সনাক্ত করতে পারিনি। তাছাড়া এ রোগের প্রাদুর্ভাব তখন হয়ত অনেকটা সীমিত ছিল। যে কারণেই হোক না কেন, আমরা জানি, লিভার বা যকৃতের ক্যান্সার এখন একটা দুর্লভ ব্যাধি নয়।

ভাইরাসজনিত লিভারের অসুস্থতা এখন আমরা পূর্বের তুলনায় অনেকটা সঠিক-ভাবে সনাক্ত করিতে পারি। যেসব ভাইরাসে লিভারের প্রদাহজনিত পাণ্ডুরোগ দেখা দেয়, সেগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন ভাইরাস এ, ভাইরাস বি এবং ভাইরাস নন্ এ, নন্ বি। ভাইরাস বি লিভার ক্যান্সারের অন্যতম প্রধান কারণ।

নানাভাবে এসব ভাইরাসজনিত ব্যাধি বিস্তার লাভ করে। বিশেষ করে ভাইরাস বি এবং নন্ এ নন্ বি বিস্তার লাভ করে বিভিন্ন ধরণের ইনজেকশনের মাধ্যমে। এই ভাইরাসে আক্রান্ত লোককে ইনজেকশন দেবার পর একই সিরিঞ্জে একজন সুস্থ লোককে ইনজেকশন দেয়া হলে সেও সংক্রামিত হতে পারে। তাছাড়া রক্ত দান, মুখে একই থার্মোমিটার ব্যবহার, থুথু, মায়ের দুধ এবং শরীরের নানা সিক্রেশনের মাধ্যমে ভাইরাস বিস্তৃতি লাভ করতে পারে।

অনেক পাণ্ডু বা জণ্ডিস রোগীকে প্রশ্ন করলে জানতে পারবেন কয়েকমাস আগে হয়ত বা ইনজেকশন নিয়েছেন, রক্ত নেয়া হয়েছে, অপারেশন করা হয়েছে অথবা তারা হাসপাতালে ছিলেন। এই সময়ে ভাইরাস তাদের শরীরে প্রবেশ করে। সংক্রমণের পর রোগের লক্ষণ দেখা দিতে যে সময়টুকু লাগে তাকে বলা হয় ইনক্যুবেশন পিরিয়ড। আর ভাইরাস বি হেপাটাইটিসের ইনক্যুবেশন পিরিয়ড ছয় সপ্তাহ থেকে ছয় মাস হতে পারে। সে সময়ে জণ্ডিস দেখা দেয়। আবার রক্ত দেয়া-নেয়া, ইনজেকশন এ সব কথা হয়ত তার মনেও থাকবে না। অথচ এসব কারণ থেকেই এ রোগের উৎপত্তি।

ভাইরাস বি থেকে লিভারের ক্রণিক প্রদাহ, ক্রণিক প্রদাহ থেকে সিরোসিস এবং সিরোসিসের উপর ক্যান্সার আস্তে আস্তে উৎপত্তি লাভ করে। তাহলে বুঝা গেল, ভাইরাস বি হেপাটাইটিস ক্যান্সারের যে অন্যতম প্রধান কারণ তা আমাদের অভ্যাস, অজ্ঞতা বা গাফিলতির কারণে হয়ে থাকে।

গর্ভবতী মায়ের ভাইরাস বি হেপাটাইটিস থাকলে নবজাত শিশুদের শতকরা ৯০ জন এতে সংক্রামিত হবার সম্ভাবনা থাকে। লিভার ক্যান্সার বিভিন্ন কারণে

হলেও ভাইরাস বি জনিত হেপাটাইটিস নিঃসন্দেহে প্রধান। এই ভাইরাস বি সংক্রমণ প্রতিরোধ যদি সম্ভব হয় তাহলে ক্যান্সারের আক্রান্ত হবার সম্ভবনা হ্রাস পায়। আগেই বলা হয়েছে নানা ধরনের ইনজেকশন, সিরিঞ্জ কিংবা রক্ত নেয়ার মাধ্যমে এই রোগ বিস্তার লাভ করে। অতএব যে কোন সামান্য কারণে সুঁই ফুটানো থেকে শুরু করে অপারেশন পর্যন্ত এই রোগ বিস্তারে সাহায্য করে। তাছাড়া যে ভাইরাস থেকে এই রোগের উৎপত্তি, তা অনেকের শরীরে সুস্থ অবস্থায় বাহক বা কেরিয়ার হিসাবে থাকতে পারে। এ সব বাহকের রক্ত থেকে নানা উপায়ে এই ভাইরাস অন্যের মধ্যে সংক্রামিত হয়। সুতরাং ইনজেকশন, রক্ত নেয়া কিংবা কোন কারণে শরীরে সুঁই ফুটানো কোনটাই নিরাপদ নয়।

যদি জীবন রক্ষার জন্য রক্ত নেয়া বা রক্ত দেয়া অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায় তাহলে ভাইরাস বি রক্তে আছে কিনা তা পরীক্ষা করে নিতে হবে। যে রক্তদানকারীর শরীরে এই ভাইরাস আছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়, সে ব্যক্তির রক্ত নেয়া যাবে না।

একই কারণে এসব লোকের ব্যবহৃত জিনিসপত্র যেমন থার্মোমিটার; সিরিঞ্জ ইত্যাদি আর কেউ ব্যবহার করতে পারবে না।

সুখের বিষয়, এ বিশিষ্ট ভাইরাসজনিত রোগ প্রতিরোধক টিকা সম্প্রতিককালে পৃথিবীর নানা দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর উপকারিতা এখন প্রমানিত। অন্যান্য টিকার তুলনায় এটা এখনও ব্যয়বহুল। নির্বিচারে এর ব্যবহার তাই সমীচীন নয়। বে ক্ষেত্রবিশেষে এর ব্যবহার অতি প্রয়োজনীয়। যেমন মায়ের রক্তে এই ভাইরাস থাকলে নবজাত শিশুকে এই টিকা দেয়া উচিত। চিকিৎসক এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী হাসপাতালের বিভিন্ন জানা-অজানা রোগী থেকে এ রোগ সংক্রামিত হতে পারে, তাদেরও এই টিকা নেয়া উচিত। যে পরিবারে লিভার ক্যান্সার বেশী ধরা পড়ে, সে পরিবারের সকলের এই টিকা নেয়া প্রয়োজন।

কি কি উপায়ে হেপাটাইটিস বি ভাইরাস বিস্তৃতি লাভ করতে পারে, তা আলোচনা করা হয়েছে। এসব বিষয়ে সকলকে সচেতন হতে হবে। যে সব অভ্যাস বা প্রক্রিয়া এই রোগ বিস্তারে সহায়তা করে সেগুলো বর্জন কিংবা সেগুলো সম্বন্ধে উপরোক্ত সতর্কতা গ্রহণ করা উচিত। যেমন ধরুন ইনজেকশন যেখানে অপরিহার্য সেখানে ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ ব্যবহার করা নিরাপদ। এই সিরিঞ্জে কাউকে ইনজেকশন দেবার পর দ্বিতীয় বার ব্যবহার করা যাবে না। রোগীর আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ ব্যবহার যদি সম্ভব না হয়, তাহলে তাকে নির্দেশ দিতে হবে আলাদা সিরিঞ্জ এবং ইনজেকশনের সুঁই কিনতে। এটা শুধু একই রোগীর জন্য ব্যবহৃত হবে এবং ইনজেকশনের পূর্বে কমপক্ষে আধঘণ্টা গরম জলে ফুটিয়ে নিতে হবে।

অহেতুক ইনজেকশন দেয়া একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, ইনজেকশনের উপকারিতা বেশী। সীমিত কয়েকটা ওষুধ ছাড়া রোগী যেখানে

মুখে খেতে পারে, সেখানে ইনজেকশন দেবার কোন যৌক্তিকতা নেই। অথচ অন্ধ বিশ্বাসে অনেকে মুখে না খেয়ে ইনজেকশন নিতে আগ্রহী। এ সমস্ত প্রবল ইচ্ছার সাথে কিছু সংখ্যক চিকিৎসকের নমনীয়ভাব সরলপ্রাণ রোগীকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়। পরিণতি সম্বন্ধে তাদের ওয়াকিবহাল করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

ছত্রাকজনিত বিষাক্ত পদার্থ বিভিন্ন খাবারের সাথে শরীরে প্রবেশ করে লিভারের ক্ষতি করতে পারে। খাবার জিনিস এমনভাবে রাখতে হবে যাতে ছত্রাক জন্মাতে না পারে। সাধারণত ভিজা কিংবা স্যাঁতসেঁতে কিংবা স্তূপীকৃত ধান চাল ইত্যাদি খাবারের মধ্যে যে বিশেষ ছত্রাক আক্রমণ করে তার নির্গত বিষাক্ত পদার্থের নাম এফ্লাটক্সিন। এশিয়ায় এবং আফ্রিকার অনুন্নত দেশগুলোতে এফ্লাটক্সিনজনিত যকৃতের পীড়া উন্নত দেশের তুলনায় বেশী। এ ধরনের রোগ থেকে লোকের সিরোসিস এবং লিভার ক্যান্সার হতে পারে। এ ধরনের খাদ্যদ্রব্যের সংরক্ষণের ব্যবস্থা এমন হতে হবে যাতে বিশেষ ছত্রাক সেখানে জন্মাতে না পারে।

এলকোহল বা মাদক দ্রব্য লিভার বা যকৃতের জন্য ক্ষতিকর। অবশ্য মদ পানের বদ অভ্যাস পশ্চিমা দেশের তুলনায় বাংলাদেশে কম। তবুও নানা নামের সুধা, সুরা এবং এ ধরনের বাজারজাত তথাকথিত টনিক আসলে মদ ছাড়া আর কিছু নয়।

স্বার্থান্বেষী বা ব্যবসায়ীদের জোরালো প্রচারণার মাধ্যমে অনেকে এগুলোতে আকৃষ্ট হয় এবং শেষ পর্যন্ত এদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারে এর কুফল যে কতটা তা সহজেই অনুমান করা যায়। অধিকন্তু স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে এগুলো কিছুতেই নিরাপদ নয়।

এ পর্যন্ত যা বলা হয়েছে তাতে বুঝা যায়, লিভার ক্যান্সারের যে কয়টি কারণ আমাদের জানা আছে, মোটামুটিভাবে এর সবকটি প্রতিরোধ সম্ভব। যে দুটো ক্যান্সার সম্বন্ধে আলোচনা করা হোল, তার কোনটির সফল চিকিৎসা ব্যবস্থা আমাদের জানা নেই। প্রতিরোধই একমাত্র প্রতিকার। এর কোন বিকল্প নেই।

ধূমপান : স্বাস্থ্যগত ও আর্থিক দিক

মনে পড়ে ১৯৪৮-৫০ সালের কথা। তখন আমি কলকাতা মেডিকেল কলেজের দ্বিতীয় পর্বের (ক্লিনিকেল) ছাত্র। তৃতীয় বর্ষ থেকে রুগীদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়। লিভার সিরোসিস্ আজকালকার মত তখনও হাসপালের বিভিন্ন রুগীদের মধ্যে অন্যতম প্রধান স্থান অধিকার করত। শীর্ণকায়, কিছুটা বিবর্ণ চেহারা, অস্বাভাবিক-ভাবে ফোলা পেট এবং অনেক ক্ষেত্রে ফোলা দুটো পা এখনও চোখের সামনে ভেসে ওঠে।এই ধরনের চেহারা নিয়ে লিভার সিরোসিস রুগী হাসপাতালের বহির্বিভাগে প্রায়ই ভিড় জমাত। আজও জমায়। ছাত্র হিসাবে আমাদের শেখানো হতো এই রোগের প্রধান কারণ পুষ্টিহীনতা। মদ্যপানের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। ক্রমে ক্রমে বেশ কয়েক বছর কেটে গেল—আমরা জানতে পারলাম ফ্রান্সে লিভার সিরোসিস অন্যান্য তুলনায় অনেক বেশী। মদ্যপানের দিক দিয়ে এদেশ সবচেয়ে সেরা। আমেরিকার মদ্যপান তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম হলেও বৃটেনের উর্ধ্বে তার স্থান। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মদ্যপান কোন সময় সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়নি। সিরোসিসের ওপর গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত অধিকাংশ চিকিৎসা-বিজ্ঞানী পশ্চিমা উন্নত দেশগুলোতে সীমাবদ্ধ ছিল। হয়ত-বা ব্যক্তিগত অথবা সামাজিক কারণে সময়মত সঠিক তথ্য ধরা পড়েনি। সে যাই হোক, অতিরিক্ত মদ্যপান লিভার সিরোসিসের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে আজ স্বীকৃত।

ধূমপানের গোড়ার কথা অনেকটা একই ধরনের। একদিকে ধূমপায়ী এবং তৎসংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী অন্য দিকে সত্যনিষ্ঠ চিকিৎসাবিজ্ঞানী এ-দুয়ের টানা-হেঁচড়ায় প্রকৃত তথ্য অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। ১৯৬২ সালে লণ্ডনের রয়েল কলেজ অফ ফিজিশিয়ান "ধূমপান ও স্বাস্থ্য" সম্বন্ধে অনেক তথ্যপূর্ণ একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। যতদূর মনে হয় ধূমপানের বিরুদ্ধে এটাই একটা পরিকল্পিত এবং শক্তিশালী প্রথম পদক্ষেপ।

আজকালকার দিনে ধূমপান এবং স্বাস্থ্যের ওপর তার প্রভাব সম্পর্কে অনেক তথ্য আমাদের জানা আছে। আমরা জানি শরীরের এমন কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই যেটা ধূমপানের কুফল থেকে রেহাই পেতে পারে। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ থেকে পায়ে গ্যাংগ্রিন যে কোন কিছু ধূমপানের কুফল হিসাবে দেখা দিতে পারে। ধূমপান ক্রনিক ব্রংকাইটিস এবং ফূসফুসের ক্যান্সারের অন্যতম প্রধান কারণ। বাংলাদেশে পেটের আলসার একটা সাধারণ ব্যাধি। এই ধরনের রুগীর সংখ্যা অনেক। ধূমপায়ী আলসার

রুগী সময়মত চিকিৎসার সুফল লাভ করতে পারে না। তাদের আলসার নিরাময় হতে অনেক বেশী সময় লাগে। ধূমপানজনিত বিষক্রিয়া শরীরের বিভিন্নস্থানে ছড়িয়ে পড়তে পারে, এর ফলে মূত্রাশয়ের ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে। গর্ভাবস্থায় ধূমপান করলে নবজাত শিশু ক্ষীণকায় হয় এবং প্রথম কয়েক মাসে বিভিন্ন ধরনের শ্বাস-রোগের প্রবণতা থাকে। এই সমস্ত শিশুর মৃত্যুর হার অনেক বেশী।

ধূমপানের কুফল প্রমাণিত হওয়ার পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পশ্চিমা দেশগুলোতে এখন আর যেখানে সেখানে নির্বিবাদে ধূমপান করা যায় না। সিনেমা হল, লাইব্রেরী, কনফারেন্স রুম এবং অন্যান্য মিলনায়তনে ধূমপান এখন নিষিদ্ধ। যানবাহনে ধূমপায়ীদের জন্য নির্ধারিত স্থানে থাকে। এমন কি সিগারেটের প্যাকেটে সাবধানবাণী লেখা থাকে, যেমন "ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।" অথচ এইসব দেশ থেকে তৃতীয় বিশ্বে যে-সমস্ত সিগারেট রফতানী করা হয় তাতে সে সাবধানবাণী লেখা থাকে না। শুনেছিলাম বাংলাদেশে দামী সিগারেট আমদানী নিষিদ্ধ। বিত্তবান এবং প্রভাবশালী ধূমপায়ীদের 'আভিজাত্যের' নিদর্শনস্বরূপ এইসব সিগারেট প্যাকেট যেভাবে হাতে দেখা যায় তাতে মনে হয় না এগুলো নিষিদ্ধ।

খুব বেশীদিন আগের কথা নয়, বাংলাদেশ তামাকবিরোধী আন্দোলন ধূমপানের ওপর এক সেমিনারের আয়োজন করেছিল। এতে অংশ নিয়েছিলেন অন্যদের মধ্যে এডিনবরা রয়েল কলেজ অব ফিজিশিয়ানের ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট স্যার জন ক্রফটন এবং লেডী ক্রফটন। তাঁদের উভয়ের তথ্যপূর্ণ বক্তৃতার মধ্যে কয়েকটি বিষয় সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে। তাঁরা বলেন, বিদেশে রফতানীকৃত সিগারেটের মধ্যে নিকোটিনের পরিমাণ তাঁদের নিজেদের দেশে ব্যবহৃত সিগারেটের চেয়ে বেশী। এছাড়া তাঁদের দেশে ধূমপ ন কমতির সাথে-সাথে রফতানীর পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক বেড়ে গেছে। ধরে নিতে হবে তৃতীয় বিশ্ব সময়োচিত পদক্ষেপ না নিলে ক্রমে-ক্রমে অধিক হারে উন্নত দেশসমূহের সিগারেট ব্যবসায়ীদের শিকারে পরিণত হবে এছাড়া স্বদেশের ব্যবসায়ীরা তো আছেই। পত্রপত্রিকার মাধ্যমে তামাক-ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ দেখতে পাই। দাবী করা হয় অনেক সুযোগ-সুবিধার—যাতে করে তামাক শিল্প আরো প্রসার লাভ করতে পারে।

জনবহুল বাংলাদেশে বেকার সমস্যা প্রকট। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে তামাক শিল্প যদি বিলুপ্ত হয় বেকারত্বের সংখ্যা কি বাড়বে না? এই সমস্ত শিল্পে নিয়োজিতদের ভবিষ্যং কি হবে? এখন দেখা যাক তামাক শিল্প উৎপাদনমুখী নাকি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর। এ বিষয়ে যে কয়টি তথ্য আমাদের জানা আছে মোটামুটিভাবে তা হল—(১) বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্বাসকষ্টজনিত কর্মক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার প্রধান কারণ ধূমপান, (২) ধূমপান হৃদরোগের অন্যতম কারণ। (৩) ধূমপান বিভিন্ন শিল্পকারখানায় অন্যতম অগ্নিকাণ্ডের কারণ। যেমন ১৯৭৪ সালে বিলেতে বিভিন্ন শিল্প সংস্থায় অগ্নিকাণ্ডের শতকরা ২০ ভাগ কারণ ধূমপানজনিত।

(৪) বিভিন্ন শিল্পে কর্ম দিন (Working days) নষ্টের অন্যতম প্রধান কারণ ধূমপানজনিত বিভিন্ন রোগ।

যুক্তরাজ্যে ১৯৮০ সালে ৩৫৮,০০০ ০০০ কর্ম দিন (Working days) বিভিন্ন রোগের জন্য নষ্ট হয়। তার মধ্যে ৫০,০০০,০০০ দিন নষ্ট হয় ধূমপানজনিত বিভিন্ন রোগে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বৎসর ধূমপানজনিত রোগে উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাসের ফলে ক্ষতির পরিমাণ ১২—১৮ মিলিয়ন ডলার।

হিসেব করে দেখা গেছে যুক্তরাজ্যে তামাক শিল্পে যত লোক নিয়োজিত আছে তার দ্বিগুণ লোক মারা যায় প্রতি বছর ধূমপানজনিত রোগে।

বিভিন্ন বিষয়ে নানা কারণে আমাদের দেশের সঠিক তথ্য বের করা মুশকিল। তবে কয়েকটি বিষয়ে অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা প্রায় নির্ভুল অনুমান করতে পারি। যেমন ধরা যাক, ধূমপানজনিত অগ্নিকাণ্ডের কথা। গ্রামবাংলায় প্রায় প্রতিটি ঘর এমনভাবে তৈরী যেখানে অগ্নিকাণ্ড অতি সহজ ব্যাপার। এখানকার সহজ-সরল অধিবাসী যেখানে-সেখানে নিঃসঙ্কোচে জ্বলন্ত সিগারেট বা বিড়ি ফেলতে অভ্যস্ত। দুর্ভাগ্যক্রমে যদি এর কোন একটা এমন জায়গায় পড়ে যেখানে আগুন লাগা সহজ তাহলে গ্রামকে গ্রাম কয়েক ঘন্টার মধ্যে উজাড় হয়ে যেতে পারে। সেখানে ফায়ার ব্রিগেড নেই। সব জায়গায় উপযুক্ত জলের ব্যবস্থা নেই, অগ্নিনির্বাপক কোন সংগঠন নেই। শহরেও ভিন্ন পরিস্থিতিতে অনুরূপ দুঃখজনক ঘটনা মাঝে-মাঝে দেখতে পাওয়া যায়। বস্তি এলাকায় অথবা পাটের গুদামে। এই সমস্ত কারণে ক্ষতির পরিমাণ আমাদের হিসাবের খাতায় লেখা থাকে না। পত্রপত্রিকার মারফত একটা আনুমানিক হিসাব প্রচার করা হয়। সেগুলোকে আংশিক সত্য হিসাবে ধরে নিলেও ধূমপানসংশ্লিষ্ট অগ্নিকাণ্ড যে বিরাট একটা আর্থিক ক্ষতির কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ-ছাড়া আমাদের শিল্প-কারখানার মান, পরিবেশ, শ্রমিকদের বাসস্থান কতটুকু স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল সেটা ভেবে দেখার মত। তার ওপর ধূমপান নিঃসন্দেহে স্বাস্থ্যহানির একটা প্রধান কারণ। সর্বনিম্ন দামের এক প্যাকেট সিগারেট কিনতে যা পয়সা খরচ হয় তার পরিবর্তে স্বল্প বেতনভুক কর্মচারী অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় খাবার থেকে বঞ্চিত হয়। দৈনিক কমপক্ষে এক টাকার এক প্যাকেট সিগারেটের বিনিময়ে সে হারায় একটি কলা কিংবা একটি ডিম। ফলে পুষ্টিহীনতা এবং ধূমপানজনিত বিভিন্ন রোগে তার কর্মক্ষমতা কমে যায়। এভাবে আমাদের ক্ষতির পরিমাণ জানা না থাকলেও নিঃসন্দেহে বলা যায়, তামাক শিল্প আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষতির অন্যতম প্রধান কারণ। ধূমপানজনিত কারণে কত লোক অকালে মৃত্যুবরণ করে, কত লোক গৃহহারা হয়, কত শিল্প তার সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয় এ-সবের প্রকৃত তথ্য যখন জানা যাবে তখন নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে তামাক শিল্প একটা মারাত্মক মারণাস্ত্র। জাতির জন্য এটা অর্থনৈতিক সঙ্গতি আনতে পারে না, বরঞ্চ একটা ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

'দু'হাজার সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য' এই অঙ্গীকারের সাথে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই জন্য আমাদের যতই সঙ্গতি থাকুক না কেন, ধূমপানজনিত রোগ থাকবেই এবং তা যদি থাকে আমাদের এই অঙ্গীকার কার্যকরী হতে পারে না।

'বাংলাদেশ তামাক-বিরোধী আন্দোলন' একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। কয়েকজন নিষ্ঠাবান কর্মী নিয়ে এটা গঠিত। উদ্দেশ্য—এই আত্মঘাতী বদ-অভ্যাসের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে আন্দোলন গড়ে তোলা। আমরা আশা করব সরকার, শিল্প সংস্থা এবং জনসাধারণ সকলের সহযোগিতায় এ-আন্দোলন দিন-দিন শক্তিশালী হয়ে উঠবে, সফল হবে, সার্থক হবে।

আপনি ধূমপান না করলেও…

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও যুক্তরাজ্যে সাতটি এবং পৃথিবীর অন্যান্য দশটি দেশে পরিচালিত ত্রিশটি জরিপের মাধ্যমে যে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় তা হলো, ফুসফুসে ক্যান্সারের আশঙ্কা প্রত্যক্ষভাবে পেয় সিগারেটের অনুপাতে বেড়ে যায়। ধূমপায়ীদের মধ্যে এর হার অধূমপায়ীদের চেয়ে ২০/৩০ গুণ বেশি।

ক্রনিক ব্রংকাইটিস এবং এমফিসেমার হার অধূমপায়ী অপেক্ষা ধূমপায়ীদের মধ্যে বেশী। দেখা যায়, যারা দিনে বিশটি বা তার বেশী সিগারেট পান করেন, তাদের মধ্যেই এর প্রকোপ সবচেয়ে বেশী. অধূমপায়ীদের চেয়ে প্রায় ১৫/২০ গুণ। যুক্তরাজ্যের চিকিৎসকরা ধূমপান সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করেছেন বলে তাদের মৃত্যুর হার আজ ১০/৩০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এমফিসেমা এবং ক্রনিক ব্রংকাইটিসদের মূল নিহিত রয়েছে ধূমপানে ও পরিবেশ দূষণের ফলে। এদের দ্বিতীয়টি দমন করা সোজা না হলেও প্রথমটি আমাদের দমন-ক্ষমতার মধ্যেই রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে পরিচালিত জরিপ থেকে জানা যায়, করোনারী আর্টারী ডিজিজ এর নেপথ্যে ধূমপানের কু-প্রভাব রয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে এটাই মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ। ধূমপান রক্তনালীকে সংকীর্ণ করে শরীরের বিভিন্ন অংশে যে রক্ত সরবরাহ হ্রাস করে. তারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত উল্লিখিত তথ্যসমূহ থেকে পাওয়া যায়। স্ট্রোক থেকে মৃত্যুর হার অধূমপায়ীদের চেয়ে ধূমপায়ীদের মধ্যেই বেশী। ধূমপায়ীদের মধ্যে 'ইণ্টারমিটেন্ট ক্লডিকেশন'-এর হারও অধূমপায়ীদের চাইতে বেশী। অধূমপায়ীদের থেকে ধূমপায়ীদের মধ্যে পেপটিক আলসারের হার প্রায় দ্বিগুণ।

খুব বেশীদিন আগের কথা নয়। ১৯৭৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রে সার্জন জেনারেল রিপোর্টে অনৈচ্ছিক ধূমপানের ওপর একটা অধ্যায় লেখা হয়। এর উপসংহারে বলা হয়. 'স্বাস্থ্যবান অধূমপায়ীরা সিগারেটের ধোঁয়ার পরিবেশে থাকলেও মোটামুটিভাবে কোনো ক্ষতি হয় না। যে সামান্য প্রতিক্রিয়া হয় সেগুলো বরং মানসিক।' হৃদপিন্ড ও ফুসফুসের রুগীদের ধূমপানের পরিবেশ ক্ষতিকারক বলে এই রিপোর্টে অবশ্য স্বীকার করা হয়।

পরিবেশের ওপর ধূমপানের কুফল কিছুদিন আগে পর্যন্ত অনুভূতি-বিতৃষ্ণা এবং সামান্য কিছু শারীরিক প্রভাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। যেমন চোখ, নাক এবং গলায়

কিছু-কিছু অস্বস্তি ভাব। ধূমপায়ীরা কোনো সময় নিজেদের অপরাধী মনে করতেন না। কারণ তাদের ধারণা ছিল ধূমপান পরিবেশকে দূষিত করে না।

সম্প্রতি ঐচ্ছিক বা প্রত্যক্ষ ধূমপায়ী এবং অনৈচ্ছিক বা পরোক্ষ ধূমপায়ী সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা গেছে। অনৈচ্ছিক বা পরোক্ষ ধূমপায়ী কতোটুকু বিপদগ্রস্থ হবেন তা নির্ভর করে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ওপর। যেমন আবাসিক পরিবেশেও ধূমপানের কুফল পরিলক্ষিত হয়েছে। ধূমপায়ী মাতা-পিতার শিশুদের মধ্যে বিবিধ শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত রোগের প্রকোপ তাদের জন্মের প্রথম বছরে বেশী করে পরিলক্ষিত হয়।

গর্ভাবস্থায় ধূমপান জরায়ুর পরিবেশ দূষিত করে। ফলে নবজাতদের ওজন তুলনামূলকভাবে কম হয়। এমন কি, জন্মের কিছুদিনের মধ্যে এ-সমস্ত শিশুদের মৃত্যুর হারও অনেক বেশী। যে সমাজে ধূমপায়ীদের সংখ্যা নগণ্য নয় অথবা যেখানে স্বল্প পরিসর স্থানে অনেক লোক জমা হয়, সেখানে ধূমপানের বিপদ একই পরিবেশের সবার বেলায় প্রযোজ্য।

ধূমপায়ী এবং অধূমপায়ীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব আজও বিদ্যমান। যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশে বিভিন্ন জরিপের মাধ্যমে জানা গেছে, অধূমপায়ীরা ধূমপায়ীদের পরিবেশে এলে প্রায় সমভাবে বিপদের সম্মুখীন হয়। এই সত্য ধূমপায়ীদের বিরুদ্ধে অধূমপায়ীদের যুক্তির সহায়ক। ১৯৭৯ সালের মে মাসে প্রকাশিত বৃটিশ মেডিক্যাল জার্নালের সম্পাদকীয়ের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক নয়। এতে ধূমপানের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক তৎপরতা জোরদার হবে বলে মনে করি। 'মন্ত্রী পরিষদের কোনো সদস্য ধূমপানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে আপাতদৃষ্টিতে যে-সব অসুবিধের সম্মুখীন হবেন বলে মনে করেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলে সেগুলো তেমন বাধার কারণ হতে পারে না। বিগত ত্রিশ বছরে আমরা দেখেছি, বিভিন্ন শিল্পে ক্রম-বিলুপ্তি এবং রূপ-পরিবর্তন। যেমন ধরুন রেলওয়ে, জাহাজ নির্মাণ, তুলা উৎপাদন ইত্যাদির কথা। ইরানের শাহের পতনের অব্যবহিত পরেই ট্যাঙ্ক-উৎপাদন শিল্পে নিয়োজিত কর্মীদের সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী কাজে নিয়োগ করা হয়। এ যদি সম্ভব হয় তবে তামাক শিল্পে যারা নিয়োজিত রয়েছে তাদের জীবন-নির্বাহ পদ্ধতির প্রেক্ষাপটও পরিবর্তন করা যাবে না কেন? জনসাধারণের সুস্বাস্থ্যের দায়িত্ব যে সেক্রেটারী অব স্টেইটের উপর নিয়োজিত, এ সমস্ত জেনে শুনেও যদি তিনি সন্দিহান হন তবে আমরা বলবো, তাঁর একবার ভাবা উচিৎ যুক্তরাজ্যে তামাক শিল্পে নিয়োজিত কর্মীর সংখ্যা ৩৬,০০০-এর কাছাকাছি। অথচ ধূমপানজনিত বিভিন্ন রোগে বাৎসরিক মৃত্যুর হার কম করে হলেও ৫০,০০০।'

পশ্চিমা দেশগুলো যখন ধূমপানের বিরুদ্ধে এতো সোচ্চার এবং বিভিন্ন কল্যাণমুখী পদক্ষেপ গ্রহণে অনেকদূর অগ্রগামী; বাংলাদেশে আমদানীকৃত অথবা দেশে প্রস্তুত সিগারেটের গায়ে কেন সাবধান বাণী পর্যন্তও লেখা থাকে না? অথচ উন্নয়নশীল প্রতিটি দেশে সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে লেখা থাকে 'ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক'।

এ-সমস্ত তথ্য অনুধাবন করে ধূমপানের বিপদ সম্পর্কে সজাগ হয়ে নির্ভীকভাবে

যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের সময় এসেছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এতে সাহসিকতার পরিচয় দেবেন বলে বিশ্বাস করি। বুঝতে হবে ধূমপান সবার জন্য বিপজ্জনক, তা আপনি ধূমপান করেন আর নাই-বা করেন। বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম দৃষ্টির সামনে অনেক রহস্য আজ উন্মোচিত হয়েছে। ভুলকে মানুষ ত্যাগ করেছে। আলোর পথে এগিয়েছে। সেই অগ্রগতিকে রহিত করা অর্বাচীনতা বৈ তো কিছুই নয়। তাই ধূমপানের মতো ধ্বংসাত্মক নেশা বর্জন করা কি শ্রেয় নয়?

খাবারে কুসংস্কার

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। যে কয়টি প্রতিষ্ঠিত সত্য যুক্তিতর্কের অবকাশ রাখে না, এটা তার অন্যতম। শুধু স্বাস্থ্য বৃদ্ধির জন্যই নয়, বেঁচে থাকার তাগিদেও খাবারের দরকার।

খাবারের প্রয়োজনীয়তা আদি যুগেও মানুষের অজানা ছিল না। বস্তুতঃ খাবার সংগ্রহ ছিল তাদের প্রধান কাজ। সব প্রাণী খাদ্যের অন্বেষণে ঘুরে বেড়ায়, স্থান পরিবর্তন করে, এমন কি, দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায়।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে আমরা অনেক অজানাকে জেনেছি। খাবারের প্রতিটি উপাদান বিশ্লেষণে সক্ষম হয়েছি, প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয়, এমন কি, ক্ষতিকর খাবার চিনতে পেরেছি। মোটকথা চাহিদা অনুসারে গুণাগুণ বিচার করে সুষম খাদ্য তালিকা প্রণয়ন এখন আমাদের আয়ত্তে।

কুসংস্কার একটা ব্যাধি। এটা সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিরাজমান। যে কোন বিষয় নিয়ে কুসংস্কার বা ভ্রান্ত ধারণা থাকতে পারে। খাবার নিয়ে যে সব কুসংস্কার এদেশে প্রচলিত এখানে তার উপর কিছু আলোচনা করব।

শিশুদের বেলায়

জন্মের শুরুতেই

জন্মের প্রথম তিন দিন শিশুদের বুকের দুধ না দেয়া একটা বহুল প্রচলিত কুসংস্কার। এই সময় বুকের দুধ একটু ঘন এবং হলুদ বর্ণের হয়ে থাকে। যাকে বলা হয় 'কলষ্ট্রাম'। অনেকের ধারণা, এটা বিষাক্ত এবং অনেক ক্ষতিকর জিনিস এতে থাকে। খেলে নবজাতকের ক্ষতি হয় ভেবে স্তন থেকে চাপ দিয়ে বের করে এটাকে ফেলে দেওয়া হয়। অথচ এই কলষ্ট্রামে বিষ তো দূরে থাক রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা সম্পন্ন উপাদান থাকে এবং তা নবজাত শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বুকের দুধ যে কয়দিন শিশুকে দেওয়া হয় না, সে কয়দিন শিশুকে শুধু জল, সামান্য মধু বা চিনি মিশানো জল খাইয়ে রাখা হয়। এতে শিশুর বলতে গেলে জন্মের প্রথম তিন দিন অনাহারে কাটে, ফলে এক দিকে পুষ্টিহীনতা, অন্যদিকে কলষ্ট্রাম থেকে বঞ্চিত হওয়াতে জন্মলগ্ন থেকে শিশুর যে প্রতিরোধ শক্তি হবার কথা, তা থেকে সে বঞ্চিত হয়।

শিশুর খাবার

মায়ের দুধ বনাম গরুর দুধ

অনেকেই মনে করেন গরুর খাঁটি দুধ খাওয়ানো হচ্ছে, অতএব মায়ের দুধের দরকার কি? ঝামেলা করতে যাব কেন? এটা একটা ভুল ধারণা। ভিটামিন 'সি' গরুর দুধের চেয়ে মায়ের দুধে বেশী থাকে। লোহাও থাকে বেশী। ভিটামিন 'সি' লোহার বিশোষণ (এবসরপসান) বাড়ায়। গরুর দুধের চেয়ে মায়ের দুধে ভিটামিন 'সি' বেশী থাকায় লোহার বিশোষণ ঠিক মত হয়, গরুর দুধে তা হয় না। তাছাড়া গরুর দুধ সিদ্ধ করলে ভিটামিন 'সি' নষ্ট হয়ে যায়।

তেলজাতীয় খাবার শিশুদের শক্তি যোগায়। মায়ের দুধ এবং গরুর দুধে যথেষ্ট পরিমাণে তেল থাকে। লাফালাফি, ছোটাছুটি. এবং খেলাধুলায় শিশুদের অনেক শক্তির (ক্যালোরি) প্রয়োজন। তেল বহুলাংশে সেই শক্তি যোগাতে পারে। কোন না কোন কারণে শিশু যদি বুকের দুধ বা গরুর দুধ কোনটাই না পায় কিছু তেলজাতীয় খাবার তাকে দিতে হবে। একই কারণে শিশুদের মাখনতোলা দুধ (স্কীমড) খাওয়াতে নেই। এই দুধে তেলজাতীয় উপাদান থাকে না বলে শক্তির পরিমাণ খুব কম এবং শিশুর পুষ্টির জন্য মোটেই যথেষ্ট নয়। চীনাবাদাম এবং সয়াবিন তেলের উৎস হিসাবে শিশুদের জন্য উপযোগী খাবার।

মায়ের দুধ শিশুদের জন্য উত্তম সুষম খাদ্য। পুষ্টি উপাদান শিশুদের জন্য যতটুকু প্রয়োজন মায়ের দুধে ঠিক ততটুকুই থাকে। এটা তাদের জন্যই তৈরী। শুধু নিরাপদই নয়, এটা নির্ঝন্ঝাটও বটে। কিনতে হয় না, তৈরি করতে হয় না, বাসি হয় না, গরম-ঠান্ডার ঝামেলা নেই, শিশি-বোতল-গ্লাস-চামচ কোনটারই দরকার হয় না। এই দুধ খাওয়ানো মা ও শিশু উভয়ের জন্য উপকারী। বুকের দুধ খাওয়ালে প্রসবের পর মায়ের জরায়ু স্বল্প সময়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে এবং পুনঃগর্ভ ধারণের সম্ভাবনা বিলম্বিত হয়। এছাড়া মা ও শিশু পরস্পর পরস্পরের সান্নিধ্যে আসে বলে মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মোট কথা মায়ের দুধের বিকল্প নেই। অন্য কোন দুধ এর সমান হতে পারে না। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আমরা যেন বিভ্রান্ত না হই।

অন্যান্য খাবার

শিশুর খাবার নিয়ে কুসংস্কার একাধিক। অনেকে শিশুকে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাওয়াতে জানেন না অথবা দিতে চান না। বিশেষ করে গ্রামে এক বৎসর পর্যন্ত শিশুকে দুধ ছাড়া অন্য কোন খাবারই দেয়া হয় না। তাদের ধারণা এগুলো শিশুর পক্ষে হজম করা সম্ভব নয়।

অনেক শিক্ষিত পরিবারেরও চার-পাঁচ মাস বয়স থেকে শিশুকে অন্য খাবার দেওয়া

হয় না। অথচ এ বয়সে শিশুরা পরিবারের সব খাবার খেতে পারে। সেসব খাবার নরম হলেই হল।

অনেকে শিশুদের শাক-সব্জি দেবার কথা ভাবতে পারেন না। এগুলোর অভাবে শিশুদের ভিটামিন বা খাদ্যপ্রান 'এ' এর অভাব হতে পারে। ফলে কেউ রাতকানা এমন কি অন্ধও হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া এসব খাবারে অন্যান্য ভিটামিন এবং লোহ জাতীয় পদার্থ থাকে বলে এগুলোর অভাবে শিশুর রক্তহীনতা এবং বিভিন্ন পুষ্টিহীনতার লক্ষণ দেখা দিতে পারে। কেউ কেউ অজুহাত দেখান তাদের বাচ্চা দুধ ছাড়া অন্য কিছু খেতে চায় না অথবা পারে না। এটা অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। অতি সামান্য থেকে শুরু করে, ধৈর্য ধরে চেষ্টা চালাতে থাকলে শিশুকে বিভিন্ন খাবারে অভ্যস্ত করে তোলা তেমন কঠিন ব্যাপার নয়।

অসুখে-বিসুখে

ডায়রিয়ায়

ডায়রিয়া বা ঘন ঘন পায়খানা হলেই অনেকে বিশ্বাস করেন এটা খাবারের ফলে হয়েছে। এমন কিছু-না-কিছু খাওয়ানো হয়েছে যা শিশুর সহ্য হচ্ছে না। এতেই ডায়রিয়ার উৎপত্তি। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল হলেও বহুল প্রচলিত। সামান্য পাতলা পায়খানা হলেও এ ধারণার বশে অনেকে খাবার বন্ধ করে দেন। শুধু বার্লি আর সাগু দিতে থাকেন। এতে শিশুর যা প্রয়োজন তা পায় না। শরীর থেকে যা বেরিয়ে যাচ্ছে, তা পূরণ হয় না। তদুপরি যা চাহিদা, তাও মেটানো হয় না। পরিণতি সহজেই অনুমান করা যায়। বিভিন্ন জীবনরক্ষাকারী রাসায়নিক পদার্থ, লবণ ও জল শরীর থেকে বেরিয়ে যায় বলে এগুলোর ঘাটতি পূরণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অন্যথায় পরিণতি ভয়াবহ হবার সম্ভাবনা থাকে।

খুব বেশী দিনের কথা নয়। কলেরা হলে ধরে নিতে হত মৃত্যু অবধারিত। লবণ-গুড়- সরবত আবিষ্কারের ফলে এই মৃত্যুর হার এখন অনেক নীচে। প্রতি একশ' জন কলেরা রোগীর নিরানব্বই জনকে সুস্থ করে তোলা এখন সম্ভব। ডায়রিয়ার বেলায়ও একই কথা। এ ছাড়া আমরা এখন প্রমাণের উপর ভিত্তি করে জানি, শিশুদের ডায়রিয়া খাবারের দোষে, কিংবা বদহজমের লক্ষণ নয়। এটা নানা ধরনের ভাইরাস অথবা ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণের ফলে।

মাতৃগর্ভ থেকে প্রাপ্ত প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মের পাঁচ মাস পর্যন্ত শিশুর শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে। যেমন ধরুন, মায়ের যদি কোন দিন হাম হয়ে থাকে, তার অর্জিত প্রতিরোধ ক্ষমতা নবজাত শিশুর শরীরে প্রবেশ করে এবং জন্মের পর পাঁচমাস পর্যন্ত থাকে। ফলে এই সময় তাদের হাম হয় না। এর পর ছয় মাস থেকে দেড় বছরের মধ্যে নানা ধরনের সংক্রমণের ফলে শিশুদের প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠে। এই সময় তাদের নানা রোগে ভোগা তাই অস্বাভাবিক নয়।

কাজেই খাবার বন্ধ করে নয়, শরীর থেকে যা বেরিয়ে যাচ্ছে, তা পূরণ করে, নিয়মিত খাবারের মাধ্যমে পুষ্টিমান বজায় রেখে, এবং প্রয়োজন বোধে জীবাণুনাশক ওষুধ ব্যবহার করে চিকিৎসা করতে হবে।

লবণ-গুড়ের সরবতের সাথে স্বাভাবিক খাবার দিতে হবে। এর পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নেই। এ সময় মায়ের দুধ বন্ধ কারার কোন যুক্তি নেই। মায়ের দুধে এলার্জি হতে পারে বলে যে ধারণা, তা সম্পূর্ণ ভুল। কাজেই ডায়রিয়া হলে শিশুর স্বাভাবিক খাবার বন্ধ করা কোন যৌক্তিকতা নেই এবং মায়ের দুধ বন্ধ করা নিষ্ঠুরতার সামিল।

হাম হলে

শিশুদের হাম নিয়ে কুসংস্কার অনেকের মনে বদ্ধমূল। হামের প্রতিষেধক টিকা এখন পাওয়া গেলেও আর্থিক এবং অন্যান্য কারণে অনেকেই এটা নিতে সক্ষম নন। অদূর ভবিষ্যতে এ রোগের প্রকোপ কমবে, এমন আশা করা যায় না।

হাম হলে বুকের দুধ, মাছ, মাংস এবং অন্যান্য স্বাভাবিক খাবার বন্ধ করে দেয়া হয়। ফলে শিশু দুর্বল হয়ে পড়ে। অপুষ্টি এবং রোগের যুগ্ম শিকার হয়ে অনেক উপসর্গ দেখা দেয়। এমন কি মৃত্যুও হতে পারে। পাতলা পায়খানা হওয়া এ সময় অস্বাভাবিক নয়। এটা হোক আর না-ই হোক, খাবারের কোন পরিবর্তন প্রয়োজন হয় না। বরং পুষ্টিকর খাবার দেয়া বাঞ্ছনীয়।

মিষ্টিতে কৃমি

অনেকেই মনে করেন মিষ্টি খেলে কৃমি হয়। এই উদ্ভট ধারণার উৎপত্তি কোথা থেকে জানা নেই। মনে হয় কেউ কোনদিন শিশুকে মিষ্টি না দেয়ার উদ্দেশ্যে একথা বলেছিলেন। আর তা-ই এ যাবৎ চলে আসছে।

মিষ্টি খেলে কৃমি হয় না। হবার কোন কারণও থাকতে পারে পারে না। এতে কৃমির উৎপত্তি বা বংশবৃদ্ধি কোনটাই হয় না। অতএব কৃমি হলেও মিষ্টি নিষেধ নয়।

শিশুর মলে

শিশুর মল নিয়ে অনেকের ভ্রান্ত ধারণা আছে। তারা যেখানে সেখানে মলত্যাগ করে। তাদের মল তেমন বিপজ্জনক নয় বলে অনেকেই মনে করেন। এদের ধারণা, বয়স্কদের মল অধিক বিপজ্জনক। এটা সম্পূর্ণ ভুল। শিশুর মলে অনেক জীবাণু থাকে। এটা রোগ বিস্তারের অন্যতম প্রধান একটা উৎস। মায়েরা অল্প জল দিয়ে বাচ্চাদের মল ধুইয়ে তেমন কোন সাবধানতা অবলম্বন না করে অন্য বাচ্চাদের খাবার পরিবেশন করেন, কোলে নেন, আদর করেন। এর ফলে, পরিবার যেখানে পরিকল্পিত নয়, এক পরিবারে যেখানে অনেক শিশু, রোগ বিস্তার সেখানে অতি সহজ।

অনেকেই বলে থাকেন ভাল জল না পেলে শৌচকর্মের জন্য খাবার জল কতইবা খরচ করবেন। জল পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার করতে হবে এটাই আসল কথা। ভাল জল পাওয়া না গেলে অপরিষ্কার জল ব্যবহার করতে হবে। পরিমাণে পর্যাপ্ত হলেই হল। ছাই দিয়ে হাত মুছে পরিস্কার করাও নিতান্ত বিজ্ঞানসম্মত। এতে এ্যালকালী বা ক্ষার থাকে বলে জীবাণু টিকে থাকতে পারে না।

মায়ের বেলায়

মায়ের বয়স, স্বাস্থ্য এবং গর্ভাকালীন খাবারের সাথে শিশু-মৃত্যু হারের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। অথচ অল্প বয়সে বিবাহ আমাদের দেশে, বিশেষ করে, গ্রামে-গঞ্জে বহুল প্রচলিত। গর্ভবতী মায়ের অপরিমিত খাবার একটা সাধারণ ব্যাপার। খাবারের বেলায় আর্থিক সঙ্গতি যতটা দায়ী, তার চেয়ে বেশী দায়ী কুসংস্কার।

মাতৃগর্ভে ভ্রূণের পুষ্টি প্রয়োজন। এর বয়স বাড়ার সাথে সাথে পুষ্টির প্রয়োজনীয়তাও বাড়ে। তাই গর্ভবতী মায়ের বাড়তি খাবারের দরকার। বিশেষতঃ গর্ভধারণের শেষের তিন-চার মাস থেকে বর্ধিত খাবারের প্রয়োজন খুবই বেশী।

প্রশ্ন হচ্ছে বেশীরভাগ লোকের যেখানে দুবেলা পরিমিত খাবার জোটে না, সেখানে বাড়তি খাবার আসবে কোথা থেকে। দামের সাথে অনেক ক্ষেত্রে খাবারের পুষ্টিমানের কোন সম্পর্ক থাকে না। সুষম খাদ্য স্বল্পদামেও সম্ভব।

গর্ভাবস্থায়

গর্ভাবস্থায় কেউ কেউ ডাল, মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি খান না। তাদের ধারণা, এগুলো খেলে পেটে অসুখ করবে, বাচ্চার ক্ষতি হবে। এমন কি অনেকেই মনে করেন ডিম খেলে বাচ্চার হাঁপানি এবং মৃগেল মাছ খেলে মৃগী হতে পারে। কুসংস্কারের শিকার হয়ে গর্ভবতী মায়েরা অপুষ্টিতে ভোগেন। ফলে গর্ভজাত শিশুরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সোজা কথায় গর্ভবতী মায়ের জন্য কোন খাবার নিষিদ্ধ হবার কোন কারণ নেই।

প্রসবের পর

সন্তান প্রসবের পর মায়েদের অনেক সময় আতুর ঘরে বন্দী করে রাখা হয়। ভাতের সাথে হলুদবাটা, মরিচবাটা এবং নিরামিষ খাওয়ানো হয়। ফলে তারা অপুষ্টিতে ভুগে, নানা রোগে আক্রান্ত হয়, বুকের দুধের পরিমাণ কমে এবং শিশু উপযুক্ত পুষ্টি পায় না। এমনি করে মা ও শিশু উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গর্ভবতী মা এবং বুকের দুধ দানকারী মা উভয়েই বাড়তি খাবারের প্রয়োজন।

জ্বর হলে

যে কোন কারণে জ্বর হলে রোগীদের খাওয়া-দাওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া হয়। সাগু, বার্লি, ডাবের জল ইত্যাদি দেওয়া হয়। এমন কি দুধ পর্যন্ত দেয়া হয় না। অথচ জ্বরের সময় দেহের তাপ বৃদ্ধির সাথে সাথে শক্তির প্রয়োজন হয় বেশী এবং সেজন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্যালোরি তথা খাবারের প্রয়োজন। এসব বিধিনিষেধের ফলে রোগী দুর্বল হয়ে যায় এবং নানা উপসর্গ দেখা দেয়। শুধু কারণ দূরীভূত হলেও সুস্থতা অর্জনে সময় লাগে অনেক বেশী।

সাধারণত ধরে নেয়া যায় প্রায় সব রোগেই খাবার-দাবারের তেমন কোন নিষেধ নেই। রোগী যদি বমি করতে থাকে আর পেটে কিছু না রাখতে পারে বা পেটে ব্যথা বা অস্বস্তিবোধ করে অথবা পেট ফেঁপে থাকে, তাহলে সাবধান হতে হবে। উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

কলেরা, আমাশয়, উদরাময়ে

কলেরা, আমাশয়, উদরাময় প্রভৃতি রোগে এখন আর খাবারের নিষেধ নেই। এই সেদিন পর্যন্ত এসব রোগীকে খেতে দেয়া হত না। ফলে মৃত্যুর হার ছিল অনেক বেশী। লবণ-গুড় সরবত ব্যবহারের ফলে মৃত্যুর হার এখন অনেক কম।

জণ্ডিস বা পাণ্ডুরোগে

নানা কারণে জণ্ডিস হতে পারে। পিত্তথলিতে পাথর অন্যতম প্রধান কারণ হলেও ভাইরাসজনিত জণ্ডিসের প্রকোপ অনেক কারণে বেড়েই চলেছে। একাধিক ভাইরাস লিভারের প্রদাহ বা হেপাটাইটিস করতে পারে। কারণে-অকারণে ইনজেকশন, সেলাইন কিংবা রক্ত গ্রহণ এই রোগ বিস্তারের প্রধান কয়েকটি কারণ। সম্প্রতি এর প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কৃত হলেও দামের দিক দিয়ে এটা কয়েক জন বিত্তশালী ছাড়া প্রায় সকলের নাগালের বাইরে।

এ ধরনের জণ্ডিসের কুফল এবং প্রতিরোধ সম্পর্কে অন্য আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আমরা এসব রোগীর খাওয়া-দাওয়ায় ভুল ধারণা বা কুসংস্কার সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করব।

সাধারণত দেখা যায় জণ্ডিস হলে অনেক খাবার বন্ধ করে দেওরা হয়। শুধু দেয়া হয় গ্লুকোজ আর সেলাইন। তার সাথে কিছু এন্টিবায়োটিক আর দু-একটা ভিটামিন। ভাইরাসের উপর এণ্টিবায়োটিকের কোন কার্যকারিতা নেই। ভিটামিন খাবারের সমতুল্য হতে পারে না। যদি তাই হোত, তাহলে খাদ্য সমস্যাই থাকতো না। খাবারের পরিবর্তে অনেকে ভিটামিন খেতে শুরু করে দিত। গ্লুকোজ এককভাবে খাবারের প্রয়োজন মেটাতে পারে না। বেশী করে গ্লুকোজ খেলে বমির

ভাব হয়। অন্য কিছু খাবার সামান্য রুচিটুকুও থাকে না। সুষম খাদ্যের অভাবেই রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে। আর এই কারণেই স্বাভাবিক নিয়মে যে সময়ের মধ্যে এটা নিরাময় হওয়া সম্ভব, তা বিলম্বিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে নানা উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

এককালে বলা হতো এবং পাঠ্যপুস্তকে লেখা থাকতো যে, জণ্ডিস হলে মাছ, মাংস, চর্বিজাতীয় খাবার খাওয়া নিষেধ। এ ধারণার কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই। দেখা গেছে, এসব রোগী যদি ঠিক মত খেতে পারে, তাদের রোগ সময় মত সারে। মোট কথা জণ্ডিস বা পাণ্ডুরোগে খাওয়া-দাওয়ার উপর যে নিষেধ রয়েছে, এটা আসলে একটা কুসংস্কার, কোন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়। রোগী যা খেতে চায়, তাই সে খেতে পারে। বরং তার খাদ্য যদি সুষম না হয়, বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণে সেটাকে সুষম করা বাঞ্ছনীয়। যেমন গরীব হলে ভাত কিংবা রুটি, ডাল, শাক-সবজি; একটু অবস্থা ভাল হলে তার সাথে মাছ, মাংস, ডিম, দুধের সংযোজন করা যেতে পারে। আর কেউ যদি মাখন খেতে চায় তাতেও নিষেধ নেই।

সেলাইনের বন্যা

সম্প্রতি সেলাইন দেয়া একটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। মাথা ব্যথা, পা ব্যথা থেকে আরম্ভ করে কারণে-অকারণে সেলাইন দেয়া হয়। আবার অনেকে বলেন, "ডাক্তারবাবু, আমার একমাত্র অসুখ দুর্বলতা। ৭-৮টা সেলাইন নিয়েও কিছু ফল পাইনি।"—এটা রোগীর অপরাধ নয়। তার বিশ্বাস জন্মেছে, বরং এ বিশ্বাস জন্মানো হয়েছে যে, সেলাইন দিলে দুর্বলতা সারে। এখন দেখা যাক কথাটা আসলে যুক্তিসঙ্গত কিনা, জল বা লবণের সংমিশ্রণে তৈরী হয় সেলাইন, আর তার সাথে গ্লুকোজ থাকলে গ্লুকোজ-সেলাইন। গ্লুকোজ থাকুক আর নাই থাকুক, যে উদ্দেশ্যে এগুলো দেয়া হয়, সেলাইন তা পূরণ করতে পারে না। শরীরে কেবলমাত্র লবণ জলের ঘাটতি হলে বিশেষ বিচার-বিবেচনার উপর নির্ভর করে সেলাইন কিংবা গ্লুকোজ-সেলাইন দেয়া হয়। লবণ-গুড়ের সরবত প্রবর্তনের ফলে সেলাইন ইনজেকশনের প্রয়োজনীয়তা অনেক কমে গেছে।

খাবারের বিকল্প সেলাইন হতে পারে না। এটা শুধু কোন একটা বিশেষ ঘাটতির সম্পূরক হতে পারে। সে যাই হোক, যে ভাইরাস-জনিত জণ্ডিস নিয়ে আলোচনা করছি তাতে সেলাইন কিংবা গ্লুকোজ-সেলাইনের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। উপকারিতার প্রশ্নই ওঠে না। এতে রোগীর হয়রানি, স্বাস্থ্যহানি, আর্থিক ক্ষতি এবং রোগের বিস্তার হয়। খাবারের পরিবর্তে অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে সহজ-সরল অসহায় রোগী এভাবে ক্ষতির শিকার হন।

পেপটিক আলসারে

পেটে আলসার (যাকে সাধারণ লোক 'গ্যাষ্ট্রিক' বলে জানে) হলে খাবার সম্বন্ধে অনেক বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। এক ঘন্টা পর পর কিছু খাওয়ার জন্য নির্দেশ-

প্রেসক্রিপশন

নামা কাগজে ছাপিয়ে কেউ কেউ ব্যবস্থাপত্র দিয়ে থাকেন। এতে আরও লেখা থাকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় দুধ খেতে হবে, রাত্রে শোয়ার সময় এক গ্লাস দুধ খেতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলো মান্ধাতার আমলের নিছক ভুল ধারণা। দুধের আমিষ এবং ক্যাল-সিয়াম পাকস্থলীতে অম্লক্ষরণ বাড়ায়। তাহলে রাতে শোয়ার সময় দুধ খেলে লাভের চেয়ে ক্ষতিই হয় বেশী। অথচ এটা একটা বহুল প্রচলিত কথা। অবশ্য চা, কফি খেলে অম্লক্ষরণ বাড়ে। এগুলো না খাওয়া ভাল। সামান্য মরিচ, মসলা দিয়ে খাবার তৈরী করলে তাতে আলসারের ক্ষতি হয় এমন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। কোন্ রোগীর কোন্ খাবার খেলে আলসারের ব্যথা বাড়বে, এমন কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। রোগীর অভিজ্ঞতার আলোকে যে খাবারে এমন হয়, সেটা বাদ দিতে হবে। মোট কথা খাবারের প্রতিক্রিয়া ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর করে এবং সে হিসাবে এগুলোকে বাছাই করতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে বাদ দিতে হবে।

ঘন ঘন খাবারের উপদেশ মানসিক এবং পারিবারিক অশান্তির কারণ হতে পারে। চিকিৎসার দিক দিয়ে বরং কুফল ডেকে আনে। যাঁরা অফিসে কাজ করেন, ঘন ঘন খাবার তাঁদের অনেকের পক্ষে সম্ভব নয়। বাসায় ঘন ঘন খাবার পরিবারের উপর বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। অশান্তির সৃষ্টি করে। আলসারের দিক দিয়ে এটা অম্লক্ষরণের সহায়ক। আর্থিক দিক দিয়ে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং সামাজিক দিক থেকে উৎপাত হিসাবে দেখা দেয়। আসল কথা আলসার রোগীর উপর খাবারের বোঝা চাপানোর কোন বিজ্ঞান-ভিত্তিক যুক্তি নেই। তাকে নিয়ম মেনে চলতে হবে, সময় মত খেতে হবে এই যা।

পুষ্টিকর খাবার

দামে আর মানে

খাবারের প্রয়োজনে ক্ষুধা বোধ হয়। তবে যে কোন কিছু খেয়ে পেট ভরালেই শরীরের প্রয়োজন মেটে না। সুষম খাদ্য খেতে হবে। খাবারের সংমিশ্রণ যত বেশী হয়, তা তত সুষম হয়। সুষম খাবার পেতে হলে নানা ধরনের খাবারের সংমিশ্রণ দরকার।

দাম কম হলে খাবার খারাপ হবে এমন কোন কথা নেই। যেমন ধরুন আটা ও চালে প্রায় সমপরিমাণ শক্তি (ক্যালোরি) আছে। চালের চেয়ে আটার দাম কম। চালে প্রায় ৭% আমিষ থাকে আর আটায় থাকে ১২%।

ভাতের পরিবর্তে রুটি খেলে অথবা ভাতের পরিমাণ কমিয়ে আটা বেশী ব্যবহার করলে দুটোর সংমিশ্রণে পুষ্টিমান বেড়ে যায়।

ডালে প্রায় ২৫% আমিষ থাকে। আর এতে শক্তি রয়েছে চালের মতই। ডাল-ভাত এবং ডাল-রুটি আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের শক্তি এবং আমিষের পরিমাণ মোটামুটিভাবে পূরণ করতে পারে।

ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ এবং খনিজ লবণ (মিনারেল) বিশেষ করে আয়রনের (লোহার) অভাব আমাদের দেশে অনেকের মধ্যে দেখা দেয়। মা ও শিশুর মধ্যে এর প্রকোপ বেশী। বিভিন্ন রকমের শাক আমাদের দেশে প্রায় সব সময় পাওয়া যায়। এসব শাকে প্রচুর পরিমাণ খাদ্যপ্রাণ ও খনিজ লবণ থাকে। পুষ্টির দিক থেকে ঘন বর্ণের শাক সবচেয়ে ভাল। অতএব দেখা যায় চাল অথবা আটা, ডাল এবং শাক অথবা সবজি —এই তিনের সমন্বয় একটা সুষম খাদ্য।

আমরা প্রায়ই ভুলে যাই যে, আমাদের দামী খাবারগুলো যেমন মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদি শাকসবজি জাতীয় খাবার থেকে উৎপত্তি হয়। গরু-ছাগল শুধু সবুজ গাছ-গাছড়া খেয়ে মাংস বৃদ্ধি করে, দুধ দেয়। অন্যদিকে হাঁস-মুরগিও গাছ-গাছড়া এবং বিভিন্ন শাক-সবজি খেয়ে শরীর বৃদ্ধি করে ও পুষ্টিকর ডিম দেয়। অথচ অনেকের কাছে শাক-সবজির কদর কম। আপেল, আঙ্গুর, কমলালেবু দামের বহরে অভিজাত খাবার। সস্তা বলে পেয়ারা আর আমলকির কদর নেই। অথচ গুণের দিক দিয়ে এগুলোর মান অনেক বেশী—ভিটামিন 'সি' থাকে প্রচুর।

চিনির দাম বাড়লে গরীবদের হতাশ হবার কারণ দেখি না। তাদের বলতে হবে চিনির বদলে গুড় খেতে। এটা চিনির চেয়ে ভাল। এতে লোহা (আয়রন) ক্যালসিয়াম ও অন্যান্য উপাদান থাকে যা চিনিতে নেই।

শাকসবজি কাঁচা খাওয়ার চেয়ে রেঁধে খাবার প্রবণতা আমাদের দেশে বেশী। শাক-সবজি বেশীক্ষণ সিদ্ধ করলে ভিটামিন 'সি' নষ্ট হয়। যে সব সবজি কাঁচা খাওয়া যায় সেগুলো রান্নার পরিবর্তে কাঁচা বা সালাদ খেলে বেশী ভিটামিন পাওয়া যায়। এছাড়া কাঁচা শাকসবজি প্রায় সময় কেটে ধোয়া হয়। এভাবে ধুলে জলে দ্রবণীয় খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন, বিশেষ করে, ভিটামিন 'সি'র অনেকটা অপচয় হয়। এগুলো ধুয়ে কাটলে অপচয় কম হয়।

অনাদৃত খিচুড়ি

বৃষ্টি-বাদলের দিনে খিচুড়ি খাবার প্রবণতা এখনও কিছু কিছু দেখা যায়। কেউ কেউ এটাকে সৌখিনতা বলে ধরে নেন। আবার অনেকে মনে করেন এটা গরীবের খাবার। চাল, ডাল, শাকসবজি দিয়ে সাধারণত খিচুড়ি করা হয়। তাছাড়া ডিম, আলু, কাঁচাকলা ইত্যাদিও কখনও কখনও মেশানো হয়। আসল কথা বহু উপাদানের সংমিশ্রণে এটা তৈরী করা হলেও চাল, ডাল ছাড়া খিচুড়ি হয় না।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে খিচুড়ি একটা সুষম খাদ্য। এটা তেল কিংবা ঘি দিয়ে তৈরী করা হয়। আমাদের খাবারে সাধারণত চর্বিজাতীয় উপাদান কম থাকে, তেল বা ঘি-এর অভাব পূরণ করে। কাঁচাকলার সংমিশ্রণে ভিটামিণ এবং লোহার পরিমাণ বাড়ে।

রান্নার দিক থেকে এটা সহজ। সময় এবং জ্বালানি খরচ দুই-ই বেঁচে যায়। খিচুড়ি যে কয়টা উপাদান দেয়া হয় তার প্রত্যেকটি যেমন চাল আর ডাল আলাদা

রান্না করতে হলে যে সময় লাগে, দ্বটো মিশিয়ে রান্না করতে সময় লাগবে এর অর্ধেক। এরকম প্রতিটি উপাদান হিসাব করলে দেখা যায় কত অল্প খরচে এবং কম সময়ে এটা তৈরী করা সম্ভব।

বয়সের দিক থেকেও খিচুড়ি ব্যবহারের কোন সীমাবদ্ধতা নেই। পাঁচ মাসের শিশ্বদের খিচুড়ি খাওয়ানো সম্পূর্ণ নিরাপদ। এটা তাদের শরীর গঠনে সাহায্য করে। হাত দিয়ে পিষে আঙ্গ্বল দিয়ে শিশ্বদের খিচুড়ি খাওয়ানো মা এবং শিশ্ব উভয়ের জন্য তৃপ্তিদায়ক। বড় এবং ব্বড়োদের বেলায়ও খিচুড়ির একই গ্বণ। মোট কথা সব বয়সের মান্বষের জন্য এটা একটা স্বষম খাবার।

স্বল্প খরচে আর্থিক সঙ্গতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্বষম খাদ্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের অতি পরিচিত এবং বহ্বলাংশে অনাদৃত এই খিচুড়ি।

সবুজে সোনা

ডাল-ভাত আমাদের সাধারণ খাবার। সকলে এ দ্বটো খেয়ে থাকেন। ঘন ডাল খাওয়া য্বক্তিসঙ্গত হলেও আর্থিক কারণে অনেকের ভাগ্যে তাও জোটে না। পাতলা করে হলেও এরা ডাল খান। অবশ্য পাতলা ডাল অনেকে খেয়ে থাকেন কুসংস্কারের বশে। কথায় বলে সব্বজের দেশ—বাংলাদেশ। আমি বলি সব্বজ শাকের দেশ। পথ-ঘাট, মাঠ, পাহাড়-পর্বত, যেখানেই যাই না কেন, যে কোন ঋত্বতেই কিছ্ব-না-কিছ্ব শাক পাওয়াষ যাবেই।

এর আগে শাকের গ্বণাগ্বণ নিয়ে কিছ্ব আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে শাক স্বষম খাদ্যের একটি বিশেষ অংশ। যে শাকের এত গ্বণ, তাকে আমরা কদর দিতে শিখিনি। অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার এবং আভিজাত্যের বড়াই নিয়ে যে শাককে এতদিন ধরে অবহেলা করেছি, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আজ তা সমাদৃত। কবির ভাষায় শাক এখন সব্বজ সোনা। একে নিয়ে রচিত হয়েছে জারী গান। সম্প্রতি প্বষ্টি ও খাদ্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যে গানটি আমার হস্তগত হয়েছে তারই কিছ্ব অংশের এখানে উদ্ধৃত দিলাম। পাঠক সমাজ এটা উপভোগ করবেন, উপকৃত হবেন, শাকের গ্বণাগ্বণ সম্বন্ধে খানিকটা অবহিত হবেন, এই আশা রাখি।

সবুজ সোনার কথা

(জারী গান)

শোনরে দেশবাসী ভাই
সোনার কথা বইলা যাই
সোনার বাংলার আছে যত সোনা
এই দ্বনিয়ার নাই তার তুলনা
ওরে—নাই তুলনা নাই
শোনরে দেশবাসী ভাই……

কচুর পাতা গুণের রাণী
শাকের রাজ্যে মধ্যমণি
পালং, লালশাক, সরিষা, সজিনা
কোনটাই নয় যে ফেলনা
এরাই মোদের সবুজ সোনা
অল্প দামেই যায় যে কেনা।
শালগম, পেঁয়াজ, বীট, গাজর মুলা
কিছুই না তার যায় যে ফেলা
মুল এদের ভাল কিন্তু আরও ভাল পাতা
খাদ্যগুণে ভরা হলেও দামে অনেক সস্তা
এই শাকেরে তুচ্ছ কইরা স্বাস্থ্য না হারাই
হাতের ধন পায়ে ঠেইলা কপাল না চাপড়াই
শোনরে.........ভাই...
চল এবার আমরা সবাই
এই কথাটি বইল্যা যাই
শাক খাব ভাই রাশি রাশি
চলবে না তা হইলে বাসী
'সি' ভাইটামিন পাইতে হইলে
রান্তে হইব অল্প জ্বালে,
হাঁড়ির উপর ঢাকনা দিতে
ভুল না হয় যেন কোন মতে।
বাড়ীর যত আনাচ্ কানাচ্
করব এবার শাকের চাষ
সবুজ সোনার অলঙ্কার মাথায় তুলে
নেবরে ভাই,
শোনরে দেশবাসী ভাই।

(নাহার কামাল আহমদ)

ভোজনে ওজন

"মেদ-মাংস বেড়ে যার দেহ স্থূল হয়
শ্রম সাধ্য কর্মে তার ধ্রুব পরাজয়।"

এই প্রবাদের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছিল তা আমার জানা নেই। তবে গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ্যদের মুখ থেকে একথা বহু বৎসর যাবৎ শুনে আসছি। পরবর্তী জীবনে এটাও উপলব্ধি করেছি যে কথাগুলো বৈজ্ঞানিকভাবেও সত্য। একটুখানি তলিয়ে দেখলে আপনিও ভিন্ন মত পোষণ করতে পারবেন না। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বা পরিচিতদের মধ্যে স্থূলকায় কেউ থাকলে এর যথার্থতার দৃষ্টান্ত পাবেন। আর আপনি নিজে যদি ভুক্তভোগী হন, তাহালে তো কথাই নেই।

যাদের ওজন বেশী, মেদ-মাংস দেহ যাদের স্থূল, জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের পরাজয় ঘটে। দৈনন্দিন কাজেও তাদের বিপদ। নানা রোগের উপসর্গও তাদের বেশী। এখানে স্থূলতা ও তার জটিলতার বিভিন্ন দিক আলোচনা করে দেখা যাক। একটা উদাহরণ দিলে এগুলো উপলব্ধি করা সহজতর হবে বলে মনে করি।

ধরুন আপনি এবং আপনার সমবয়সী আর একজন। আপানাদের উচ্চতা যদি সাড়ে পাঁচ ফুট হয়, বয়স ৪০ থেকে ৪৫ বৎসরের মধ্যে এবং আপনার ওজন যদি ২০০ পাউন্ড হয় এবং অন্য জনের ১৪০ পাউন্ড, তাহলে তুলনা করলেই বুঝতে পারবেন আপনার কত অসুবিধা। মানসিক দিক দিয়ে চিন্তা করুন কোন একটা সামাজিক অনুষ্ঠানে দু'জন এক সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন। আপনি লক্ষ্য করবেন সবাই না হলেও অনেকেই আপনার দিকে তাকাচ্ছে। অবশ্য প্রবেশ পথ যদি অপ্রশস্ত হয় আর লোকজনের সমাগম হয় বেশী, তাহলে আপনার প্রথম বিপদ সেখানেই। আগে এসেও সহজে ভিতরে প্রবেশ আপনার সম্ভব হবে না। অথচ অপর লোকটি আপনার জন্য অপেক্ষা করতে চাইলে সহজেই এ কাজটি সমাধা করতে পারেন। যাই হউক, ভিতরে প্রবেশ করার পর একটু আগেই যা বলেছিলাম, অনেকের দৃষ্টি পড়বে আপনার উপর। আপনি একটু অস্বস্তিই বোধ করবেন নিশ্চয়ই। এরপর হলের ভিতরে সাজান ভাড়া করা ফোল্ডিং চেয়ারে আপনারা দুজন পাশাপাশি বসতে গেলেন, আর অমনিই পড়ে গেলেন মাটিতে। আপনার ওজন ক্ষীণকায় চেয়ার সহ্য করতে পারল না, সেটা ভেঙ্গেই পড়ল। চারিদিকে হৈ চৈ শুরু হল। একটু আগে যে অস্বস্তি বোধ করছিলেন সেটা এখন হয়ে পড়ল একটা লজ্জাস্কর ব্যাপার। অনেকে অবশ্য ঘটনাটা উপভোগ করলেন। কিন্তু আপনি? এমন বিপর্যয় আপনার পদে পদে ঘটতে পারে। আপনি বাজারে

যান, প্রায় সকলের ধাক্কা খাবেন, এগুতে পারবেন না। রাস্তা পার হতে যান, ভয় পাবেন। কারণ শরীর এদিক ওদিক গাড়ী চলাচল দেখা আপনার জন্য অত সহজ সহজ হবে না। এছাড়া কর্মস্থলে যাওয়া-আসার ব্যাপারেও অসুবিধেয় পড়বেন আপনি। রিক্সাওয়ালা আপনাকে নিতে চাইবে না, বিশেষ করে, আর একজন যদি সাথে যান। আপনাকে তাহলে হয় একাই পুরো রিক্সা ভাড়া দিয়ে যেতে হবে, না হয় কোন রিক্সাওয়ালাকে রাজী করার জন্য অনেকক্ষণ রাস্তার পাশে অপেক্ষা করতে হবে। বাসে যদি যেতে চান তাহলে আরও অসুবিধা। বাসের ছোট দরজা এবং যাত্রীর সংখ্যার তুলনায় ভেতরে স্থানের অভাব দুটোই আপনার জন্য সমস্যা, সেই হলঘরের সমস্যার চাইতে এটা আরও প্রকট। এখানে চেয়ার ভাঙবে না, তবে বসবার বা দাঁড়াবার জায়গা পাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর হবে। আপনার যদি নিজের গাড়ী থাকে, আপনি একাই সেখানে দুজনের আসন দখল করে বসবেন। সংখ্যানুপাতে সে গাড়ীতে চালক ছাড়া আপনি নিতে পারছেন তিনজনের জায়গায় মাত্র দুইজন। অনেক সময় এজন্য পারিবারিক সমস্যা দেখা দেবে।

মোট কথা স্থূলদেহ নিয়ে আপনি যেখানেই যান না কেন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হবেন, অস্বস্তিবোধ করবেন, এমন কি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবেন। এখানেই শেষ নয়। আপনাকে ধরে নিতে হবে আপনার অতিরিক্ত ওজন আপনার শরীরের জন্য বোঝা স্বরূপ। ধরুন আপনার ওজন যা হওয়া উচিত তার চাইতে ৩০।৪০ পাউন্ড বেশী। একজন লোকের মাথায় ঐ পরিমাণ ওজন তুলে দিলে যা হয়, মোটামুটিভাবে আপনার অজ্ঞাতসারে আপনার শরীরে তাই ঘটেছে। আপনার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এর প্রতিফলন হবে। আপনার হৃৎপিণ্ডের কার্যভার বেড়ে যাবে। রক্তচাপ বৃদ্ধি পেতে পারে, বহুমূত্র রোগও দেখা দিতে পারে। উচ্চ রক্তচাপ এবং বহুমূত্র রোগের ফলে শরীরের শিরা-উপশিরায় পরিবর্তন ঘটে রক্ত সঞ্চালনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে। হৃৎপিন্ডের কর্মবৃদ্ধির সাথে সাথে রক্তসঞ্চালন যদি বৃদ্ধি না পায়, তাহলে প্রথমে বুকে ব্যথা বা এনজাইনা এবং পরবর্তী পর্যায়ে করোনারী থ্রম্বোসিস নামে মারাত্মক ব্যাধি হতে পারে। বিভিন্ন জরীপ এবং সমীক্ষায় দেখা গেছে স্থূলকায় লোকদের আয়ুষ্কাল তুলনামূলকভাবে কম।

শরীরের ওজন বহন করার প্রধান মাধ্যম হচ্ছে অস্থি। যাদের ওজন বেশী, অতিরিক্ত ওজন বহন করার জন্য তাদের অস্থিগ্রন্থিতে পরিবর্তন দেখা দেয়। সংযোজন স্থলে অধিক ওজনের ফলে অস্থির আকারের পরিবর্তন হয় এবং অষ্টিওআথ্রাইটিস নামে রোগ দেখা দেয়। যেহেতু সমস্ত শরীরের ওজন মেরুদণ্ড ও হাঁটুর মাধ্যমে মাটিতে যায়, হাঁটু, পিঠ ও কোমরের ব্যথা স্থূলকায় ব্যক্তিদের নিত্য সহচর। শরীরের অন্যান্য অস্থিগ্রন্থি বা গিরায় ব্যথা হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। এছাড়াও কুচকী ও পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে দাদ রোগ স্থূলব্যক্তিদের বেশী হয়। অধিক চর্বি জমা হওয়ার ফলে পেটের এবং পায়ের মাংসপেশীর সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণ বাধাপ্রাপ্ত হয়। এইসব মাংসপেশীর দুর্বলতার ফলে হার্নিয়া হয় এবং পায়ের শিরায় ভেরিকোসিটি দেখা দেয়। শিরায় ভেরিকোসিটি হলে শিরা সম্প্রসারিত হয় এবং পায়ের উপর আঁকাবাঁকা কালো

শিরা দেখা যায়। ভেরিকোস শিরা থাকলে পায়ে এক ধরনের চর্মরোগ (একজিমা) দেখা দেয়। এমন কি পায়ে আলসার বা ঘা হতে পারে। স্থূলকায় ব্যক্তিদের শ্বাস-প্রশ্বাসও স্বাভাবিক থাকে না এবং ফুসফুসে রক্তসঞ্চালন ক্ষমতাও হ্রাস পায়। শেষ পর্যন্ত হৃৎপিণ্ডের অক্ষমতা (ফেইলিওর) প্রকাশ পায় এবং শরীরে, বিশেষ করে, পায়ে ফোলা দেখা দেয়।

অতএব, দেখা যাচ্ছে যাদের ওজন বেশী তারা জটিলতা ও রোগের সম্মুখীন হন। আগে বলা হয়েছে তুলনামূলকভাবে এদের আয়ুষ্কাল কম। সমীক্ষা ও জরীপ চালিয়ে দেখা যাচ্ছে স্থূলতার সাথে মৃত্যুর হারের সরাসরি সম্পর্ক আছে। দেখা যাচ্ছে ওজন শতকরা ৩০ ভাগ বেশী তাদের মৃত্যুর হারও অন্যদের তুলনায় শতকরা ৩০ ভাগ বেশী। একইভাবে ৩৫ থেকে ৪০ ভাগ বেশী ওজন যাদের, তাদের মৃত্যুর হার আরও বেশী। শতকরা ৫০ ভাগ। সমীক্ষায় দেখা গেছে, স্থূলকায় লোকদের ওজন কমানো হলে এই বর্ধিত মৃত্যুর হার অনেক কমে আসে। কাজেই ওজনের আধিক্যকে অবহেলা না করে শুধু একটা জটিল রোগ হিসাবে নয়, অনেকগুলো জটিল রোগের সমষ্টি হিসাবে ধরে নিতে হবে। এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা শুধু সমীচীনই নয় —সবল, সুস্থ জীবন যাপনের জন্য অপরিহার্য্য।

এখন দেখা যাক আমরা কি করতে পারি। কোন রোগের চিকিৎসার আগে তার কারণ জানতে হয়। স্থূলতার অনেক কারণ আছে। যেটা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত সেটা হল চাহিদার তুলনায় অধিক ভোজন। অনেকেই বলে থাকেন, "অমুকের সঙ্গে একই খাবার খাই অথচ তার ওজন বাড়ে না, শুধু আমারই বাড়ে।' এটা হওয়া খুবই সম্ভব এবং তার কারণ আছে। ওজন বাড়া শুধু আপনি কি খাচ্ছেন তার ওপর নির্ভর করে না, এটা জমা-খরচের ব্যাপার। আপনি সারাদিনে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে কতটুকু শক্তি ক্ষয় করছেন, সেটার ওপরও নির্ভর করে জমার হিসাব। একই আয় করে দুজন লোক যেমন সমান অর্থ সঞ্চয় করতে পারে না, তেমনি একই খাবার খেয়ে দু'জন মানুষের ওজনও আলাদা হতে পারে।

সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের দিকে দৃষ্টিপাত করলে এই জমা ও খরচের ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হবে। আপনি নিশ্চয়ই কোন না কোন সময় ঈদের নামাজ পড়ার জন্য বায়তুল মোকাররম মসজিদে গেছেন। নামাজ শেষে বাড়ী ফেরার সময় অসংখ্য ভিখারীর মধ্যে কাউকে কাউকে কিছু দান খয়রাতও নিশ্চয়ই করেছেন। এদের মধ্যে কাউকে কি মোটা সোটা দেখেছেন? একবার রিক্সাওয়ালাদের দিকে নজর দিন। মোটা সোটা কারও কথা কি মনে পড়ে? আপনার বাড়ী যদি গ্রামে হয় অথবা মাঝে মধ্যে গ্রামে যাওয়ার সুযোগ হয়,তবে মনে করে দেখুন, গ্রামে কোন মোটা লোক দেখেছেন কিনা। অথচ গ্রামের মানুষ আপনি যা খান হয়ত তার দ্বিগুন খায়। হিসেব মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে এদের সবারই জমার চাইতে খরচ বেশী। অর্থাৎ খাবারের মাধ্যমে এদের যতটুকু শক্তি সঞ্চয় হয়, কাজের মাধ্যমে ক্ষয় হয় তার বেশী।

যাদের অর্থ আছে, খাবার আছে বা দুটোই আছে, অথচ আনুপাতিক হারে কায়িক

শ্রম কম তাদের ক্ষেত্রে ঘটনাটা বিপরীত। এরা খাবার মাধ্যমে যতটুকু জমা করে, শ্রমের মাধ্যমে ব্যয় করে তার চাইতে কম। এদের "মেদমাংস বেড়ে দেহ স্থূল হয়"। অন্য দিকে, যারা মাঠে-ঘাটে খাটে, যাদের বসে থাকার উপায় নেই, অপরিমিত খাবার সুযোগও নেই—তাদের স্থূলকায় হবার সম্ভাবনাও নেই। তবে ক্ষেত্র বিশেষে হিসাবের পরিবর্তনও ঘটতে পারে। একজন সৈনিক যতদিন পরিমিত খাবার খায় ও প্রয়োজনীয় ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম করে, ততদিন সে জমা ও খরচের সমতা বজায় রাখতে পারে। কোন কারণে কর্মস্থল পরিবর্তিত হলে সেই লোকই যদি অতিরিক্ত খাবার খায় ও নিয়মিত ব্যায়াম ও শারীরিক শ্রম না করে, তবে সে স্থূলকায় হয়ে পড়ে।

এ পর্যন্ত যে উদাহরণগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম তাতে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন খাবারের সঙ্গে যদি শারীরিক শ্রমের সমতা না থাকে, আপনার শ্রম অনুপাতে আপনার যা প্রয়োজন তার চাইতে আপনার খাবার পরিমাণ যদি বেশী হয়, তাহলে আপনার ওজন বাড়বেই। কাজেই কম খেয়েও আপনার ওজন বাড়ছে, এ ধারণা ভুল। আপনার যা প্রয়োজন তার তুলনায় (অন্যের সাথে তুলনায় নয়) আপনি বেশী খাচ্ছেন, তাই আপনার ওজন বাড়ছে। মেনে নিতে হবে ওজন বাড়ার অন্যতম কারণ অতি ভোজন অর্থাৎ ভোজনেই ওজন।

ওজন কমাতে হলে কি করতে হবে এক্ষণে তা নির্ধারণ করা সম্ভব। আপনাকে প্রয়োজনের সঙ্গে সমতা বজায় রেখে খেতে হবে। পেট ভরে খাওয়া কিছুতেই উচিত নয়। শরিয়তের নির্দেশও এ ব্যাপারে বিজ্ঞানভিত্তিক। আপনার খাবার ক্ষমতাকে তিন ভাগে ভাগ করতে হবে। এক ভাগ হবে খাবার, এক ভাগ জল, আর এক ভাগ থাকবে খালি। মোট কথা আপনার যতটুক খাবার ক্ষমতা আছে, তার চেয়ে কম খাবেন। পেট ভরে খাওয়া ওজন বৃদ্ধি ছাড়াও বদহজমী, ডায়রিয়া ইত্যাদিও ঘটাতে পারে।

আজকাল অলিতে-গলিতে সব জায়গায় মিষ্টির দোকান দেখা যায়। অতিথি আপ্যায়নের অন্যতম উপায় মিষ্টি। আরও দেখা যায় চায়ের দোকানের ছড়াছড়ি। এক কাপ চায়ে ব্যক্তিবিশেষে এক থেকে তিন চামচ চিনি দেওয়া হয়। অনেকেই প্রতিদিন ৫ থেকে ৮ কাপ চা এবং দুই তিনবার মিষ্টি খেয়ে থাকেন। এই অভ্যাস ওজন বৃদ্ধির অন্যতম সহায়ক।

এ পর্যন্ত আলোচনায় আশা করি এটা পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল যে প্রয়োজনের তুলনায় অধিক ভোজন এবং তার ফলে দেহের যে অতিরিক্ত ওজন হয় তা একটা ব্যাধি। এতে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। নিয়মিত খাবার এবং শারীরিক পরিশ্রম দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি আপনার ওজন সীমিত রাখতে চান তাহলে—

১। পরিমিত খাবার খাবেন।
২। রীতিমত কাজকর্ম, ব্যায়াম, শারীরিক পরিশ্রম করার অভ্যাস করবেন।
৩। চিনি, মিষ্টি জাতীয় খাবার যথাসম্ভব বাদ দেবেন।
৪। ঘি, মাখন, চা, চর্বি জাতীয় খাদ্য পরিহার করবেন।

৫। শাক-সবজি, তরিতরকারী বেশী করে খেলে শরীরের প্রোটিনের পুরো চাহিদা মিটবে।

৬। ভাত কম খাবেন।

৭। সম্ভব হলে খাবার সম্বন্ধে পারদর্শী লোকের কাছ থেকে এ ব্যাপারে উপদেশ নেবেন।

৮। সহজ কথায়, খাওয়া ও পরিশ্রমের ব্যাপারে গরীবী হালে চলতে হবে।

ওজন কমানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের ওষুধ বাজারে প্রচলিত আছে। এগুলোর কোনই কার্যকারিতা নেই। সম্প্রতি এগুলো নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে এর কার্যকারিতা সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে অতীতে এই সমস্ত ওষুধের বিক্রি বাড়ানো হত। এখনও কালোবাজারীদের দৌলতে এসব ওষুধের অস্তিত্ব আছে। প্রকৃতপক্ষে, এসব ওষুধ ব্যবহারে অর্থের অপচয় তো ঘটেই, অনেক ক্ষেত্রে শারীরিক ক্ষতিও হতে পারে।

মনে রাখতে হবে আরাম-আয়েসের বিভিন্ন কুফলের অন্যতম ওজন বৃদ্ধি। সারা দুনিয়ার বিত্তশালী দেশসমূহে অতি ভোজনকারী মানুষেরা যে খাদ্যের অপচয় করে, তা বন্ধ করলে সেই উদ্বৃত্ত খাদ্যে বিত্তহীন দেশসমূহের অনেক লোককে অনাহার থেকে উদ্ধার করা যেতে পারে। আমাদের দেশেও অতিভোজনকারীরা সংযমী হলে অনেক দরিদ্রের খাদ্য সমস্যা কিছুটা লাঘব করা যায়। আপনার পরিমিত খাবারের অতিরিক্ত কিছু যদি পার্শ্ববর্তী লোকের অনাহার নিবারণ করতে পারে সেটা আপনার সুখের, স্বাস্থ্যের এবং গৌরবের কথা।

হজমীতে টাকা হজম

ওষুধ নামে কত কি যে বাজারে পাওয়া যায়, এর কোন হিসাব নেই। টনিক, টেবলেট, হজমী আরও কত কি। এই ধরনের অনেক কিছু এককালে সরকারী খাতায় রেজিস্ট্রিকৃত ও প্রতিষ্ঠিত ছিল। রেজিস্ট্রেশন মোটামুটিভাবে এ সবের গুণাগুণের একপ্রকার সরকারী স্বীকৃতি। আসলে কিন্তু এই রেজিস্ট্রেশন এবং গুণাগুণের মধ্যে তেমন কোন সম্পর্ক ছিল না। কোন্ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে বা বিচারের মাপকাঠিতে এগুলো স্বীকৃতি পেয়েছিল, শত চেষ্টা করেও তার হদিস পাওয়া যায় না। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে কয়েকজন সচেতন চিকিৎসক এহেন পরিস্থিতি সম্বন্ধে সজাগ হয়ে ওঠেন। তাঁদের ঐকান্তিক আগ্রহে ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশে কয়েকজন বিশিষ্ট চিকিৎসক নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেন। তাঁদের ওপর দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল দেশে ওষুধ প্রস্তুত এবং আমদানীর ক্ষেত্রে গুণাগুণ বিচার করে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা এবং অপ্রয়োজনীয় ওষুধ বাতিল করা। এই কমিটির সুপারিশক্রমে প্রায় সাড়ে আট হাজার রেজিস্ট্রিকৃত ওষুধের সংখ্যা কমিয়ে সাড়ে চার হাজারে আনা হয়। বাদ পড়ে চার হাজারের মতো বিভিন্ন নামের তথাকথিত ওষুধ।

এর ফলে কিছুসংখ্যক ওষুধ প্রস্তুতকারক এবং ব্যবসায়ীমহল এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে তৎপর হয়ে ওঠে। কারণ এদের স্বার্থে আঘাত লাগে। প্রশাসনিক সাহায্য কিংবা সহানুভূতির অভাবে বিভিন্ন ধরনে চেষ্টা-তদবীর করেও তাদের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। নিষিদ্ধ ঘোষিত ওষুধ বাজার থেকে ধীরে-ধীরে লোপ পেতে থাকে।

১৯৭৫ সালের আগস্টের মাঝামাঝি রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে-সাথে স্বার্থান্বেষী মহল অত্যন্ত তৎপর হয়ে ওঠে। বিশেষজ্ঞ কমিটি ভেঙ্গে দেয়া হয়। উদ্দেশ্য ছিল অনেক ওষুধের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা। অবশেষে তাই হল। ফলে অনেক অপ্রয়োজনীয় এমন কি ক্ষতিকর ওষুধ বাজারে আবার প্রচলিত হয়।

এমন একটা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সচেতন চিকিৎসক সমাজ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন একথা বললে ভুল হবে। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ফোরামে এবং পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে তাঁরা জনসাধারণকে অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকর ওষুধ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করার চেষ্টা করেছেন। সরকারের সক্রিয় ভূমিকা না থাকায় এসব সীমিত প্রচেষ্টা তেমন ফলপ্রসূ হয়নি। তবে এতে প্রশাসনের অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ যে সম্ভব হয়েছিল, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এর ফলশ্রুতি হিসাবে বর্তমান প্রশাসন জন-স্বাস্থ্যের খাতিরে আন্তরিকতার সাথে এর ওপর নজর দেন। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল এইচ. এম. এরশাদের নির্দেশে ১৯৮২-র ১২ই জুন একটি

বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়। তাঁদের ওপর দায়িত্ব দেয়া হয় গুণাগুণ বিচার করে প্রচলিত ওষুধের বাছাই করা, অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকর ওষুধ বাতিল করা এবং একটা নতুন বাস্তব ওষুধনীতি প্রণয়ন করা। বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশক্রমে প্রায় দু হাজার ওষুধ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক কারণে বাতিল করা হয়। তাঁরা একটি ওষুধ-নীতিও প্রণয়ন করেন। ওষুধনীতি ঘোষণার সাথে-সাথে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ব্যবসায়ীমহল বিশেষ করে বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানী অত্যন্ত তৎপর হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের ওষুধের বাজারে তাদের আধিপত্য বিনষ্ট হোক, এটা তারা সহ্য করবেই-বা কেন? নানা ধরণের প্রচারণের মাধ্যমে তারা প্রচার করতে চেষ্টা করে জাতীয় ওষুধ নীতি ন্যায়নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। অনুরোধ জানায় পুনর্বিবেচনা করার জন্য। যাই হোক বিভিন্ন কারণে একটা রিভিউ (পুনর্বিবেচনা) কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সুপারিশক্রমে দুই-একটা ওষুধের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়।

বাংলাদেশের ওষুধনীতি আজ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশেষভাবে সমাদৃত। দেশ' বর্ণ, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নির্বিশেষে সকলেই একবাক্যে এর প্রশংসা করেছেন। আখ্যা দিয়েছেন, সময় উপযোগী এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। আরও বলেছেন, এটা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে অভিপ্রেত।

বাংলাদেশের ওষুধনীতি একটা যুগান্তরকারী ঘটনা। আসলে এটা একটা বৈজ্ঞানিক বিপ্লব। এ বিপ্লব দরিদ্র জনসাধারণের জন্য। বিপ্লব সুখের এবং শান্তির। বিত্তবান কয়েকটি পরিবারের জন্য এ বিপ্লব নয়, দেশের অগণিত জনগণের হিতার্থে এই 'ওষুধনীতি'। 'অল্প খরচে উপযোগী ওষুধ দেশের অগণিত জনগণের কাছে পৌঁছুক —সে উদ্দেশ্যে এই ওষুধনীতির প্রণয়ণ' বলেছেন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ। ছাত্র সংসদের উদ্যোগে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজে ওষুধনীতির ওপর অনুষ্ঠিত সেমিনারে তিনি একথা বলেন। অনির্ধারিত এক সংক্ষিপ্ত সফরে সেদিন তিনি চট্টগ্রাম যান। দেশের প্রত্যেকটি মেডিকেল কলেজে আমরা কয়েকজন ওষুধনীতির বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করার জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী জনাব শামছুল হকের নির্দেশে সেমিনারের আয়োজন করি। তাঁর কথায়, 'ওষুধনীতি বাস্তবায়নের এবং অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকর ওষুধ থেকে রেহাই পাবার অন্যতম প্রধান উপায় হচ্ছে উপযুক্ত ব্যবস্থাপত্র বা প্রেসক্রিপ্শন। এ-ক্ষেত্রে ওষুধনীতির সকল দিক অবহিত করা অত্যন্ত প্রয়োজন'। এই উদ্দেশ্যেই চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের ছাত্র সংসদ এই আয়োজনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। আমাদের প্রথম সেমিনার এখানে অনুষ্ঠিত হয়।

ওষুধনীতির সম্পূর্ণ পর্যালোচনা এখানে সম্ভব নয়—উদ্দেশ্যেও নয়। স্বার্থান্বেষী ওষুধ প্রস্তুতকারক এবং বিক্রেতার খপ্পরে পড়ে যুগে-যুগে অগণিত জনসাধারণ স্বাস্থ্যলাভের আশায় লোকসানের শিকার হয়েছেন তথাকথিত ওষুধ ব্যবসায়ের মাধ্যমে। এই সেদিন পর্যন্ত যেসব ওষুধ বাজারে বহুল প্রচলিত ছিল, ঘরে-ঘরে যে ওষুধ প্রায় দেখা যেত, যার প্রতি 'যা না হলে চলে না' এমন একটা বিশ্বাস ছিল, সে-সব ওষুধের তালিকায় শীর্ষস্থান অধিকার করে রেখেছিল তথাকথিত টনিক এবং হজমী ওষুধ।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অনেক সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান জরিপ করে দেখিয়েছে বাংলাদেশ তথা তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অপ্রয়োজনীয়, এমন কি, ক্ষতিকর ওষুধের পিছনে প্রয়োজনীয় ওষুধের তুলনায় খরচের পরিমাণ অনেক বেশী। শতকরা ৫০ থেকে ৮০ ভাগ টাকা অপ্রয়োজনীয় ওষুধের পিছনে খরচ করা হয়। আর বাংলাদেশে অপ্রয়োজনীয় বা ক্ষতিকর ওষুধের পিছনে খরচ করা হয় শতকরা ৭০ থেকে ৮০ ভাগ টাকা।

বিভিন্ন রকমের কার্যকারিতা দাবী করে বিভিন্ন নামে যে সব অপ্রয়োজনীয় ওষুধ বাজারে চালু আছে, সেগুলোর উপাদান, সংমিশ্রণ কিংবা উপাদানের পরিমাণ কোনটাই বিজ্ঞানসম্মত নয়। দুই-একটা উপাদান মানুষের পক্ষে উপকারী হলেও সংমিশ্রণের ফলে যে-সব উপাদানের গুণগত মান আর থাকে না। কত রকমের যে হজমী টনিক বাজারে প্রচলিত আছে, তার হিসাব নেই। এগুলোর একটা-না-একটা নাম কারো-না-কারো কাছে জানা আছে।

আপনার আমার সকলের কোন-না-কোন সময় খাওয়া-দাওয়া বা অন্য কোন কারণে হজমের ব্যাঘাত হবেই। বদহজমের অনেক কারণ। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রধান হল বেপরোয়া খাওয়া-দাওয়া। অনেকে লোভ সামলাতে না পেরে যা পান যতটা ইচ্ছে খেয়ে ফেলেন, পরবর্তী পর্যায়ে পেট ফাঁপা ঢেঁকুর ওঠা এবং পেটে অস্বস্তিবোধ করেন। এমন সময় কেউ যদি বলে থাকেন অমুক ওষুধ অত পরিমাণ খেয়ে নিলে খুব ভাল হবে। যাদের আর্থিক সঙ্গতি আছে, যারা খাওয়া-দাওয়ার পিছনে হিসেব না করে খরচ করে থাকেন, তাদের বেলায় এটা সামান্য ব্যাপার। কাউকে বাজারে পাঠিয়ে হজমী বা টনিক কিনে নিয়ে আসেন। এবং নির্দেশমত সেবন করেন। বাকি অংশ যত্নের সাথে রেখে দেন। ওষুধের গন্ধমিশ্রিত দু-একটি ঢেঁকুর সেবনকারীকে তৃপ্ত করে।

আসলে কিন্তু সময়ের ব্যবধানে সাময়িক বদহজম লোপ পেলেও তার কৃতিত্ব নেয় সেই কেনা হজমী ওষুধটি। ব্যাপারটি কিন্তু এখানেই শেষ নয়। বিজ্ঞাপন কিংবা লোককথা কিংবা কারও দেয়া ব্যবস্থাপত্রের মাধ্যমে তিনি যে ওষুধ সেবনে পরিতৃপ্তি লাভ করলেন এবং সময়ের কারণে উপকার পেলেন, সে বিশ্বাস শুধু তার মাধ্যমেই অনেকের কাছে প্রকাশ পাবে। এমনি করে এক থেকে দুই, দুই থেকে বহু লোক একটা অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা প্রচারণার এবং বিভ্রান্তির শিকার হয়ে অন্ধ বিশ্বাসের বশীভূত হয়। এভাবে এই ওষুধ বিক্রয়ের বিস্তৃতি ঘটে শহর থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে গঞ্জে এবং বিত্তবান থেকে দরিদ্র জনগণের মাঝে, দেশের আনাচেকানাচে। অথচ একটু আগেই বলেছি উপাদানের পরিমাণ এবং সংমিশ্রণে এগুলোর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

বদহজমের বিভিন্ন কারণগুলোর মধ্যে যেগুলো এক ধরনের এনজাইম দিয়ে চিকিৎসা করা হয়, সেগুলোর সংখ্যা অনধিক দুটি। একটা পেনক্রিয়াসের প্রদাহ থেকে সৃষ্টি হয়, আর একটা হয় লেকটেইনের অভাব থেকে। পেনক্রিয়াসের প্রদাহ থেকে যে রোগের সৃষ্টি, সেখানে পাউডারের আকারে পেনক্রিয়াসের এক্সট্রাক্ট দিতে হয়। তবে পরিমাণে চাহিদার তুলনায় দেড়গুণ বেশি দিতে হবে যেন খাবার পর কিছুটা নষ্ট হলেও যতটা চাহিদা তা পূরণ হয়।

পাকস্থলীর এসিড বা অম্লের সংমিশ্রণে এনজাইম নষ্ট হয়। এই জন্য এনজাইম

দেবার আগে বিভিন্ন উপায়ে অম্লের পরিমাণ কমানো হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে খাবার পর-পরই যখন অম্লের পরিমাণ কম থাকে, তখন এই ওষুধ সেবন করা হয়। আবার আলসার রোগের যে-সব চিকিৎসা প্রচলিত আছে সেগুলো ব্যবহার করা হয়। এসিড কমনোর সবচেয়ে শক্তিশালী ওষুধ সাইমিটিডিন (টেগামেট) কেউ-কেউ ব্যবহার করার সুপারিশ করনে। নিঃসন্দেহে সাইমিটিডিন ব্যবহারে যে পরিমাণ অম্ল হ্রাস পায়, তাতে এনজাইমের কার্যকারিতা নষ্ট হয় না। কিন্তু সাইমিটিডিনের বর্তমান বাজার দর মধ্যবিত্ত পরিবারের সামর্থের বাইরে। যারা দরিদ্র এই ওষুধ তাদের ব্যবহারের প্রশ্নই ওঠে না।

পাকস্থলীর অম্ল ছাড়াও এনজাইম অতি সহজে বিনষ্ট হয়। বিভিন্ন তরল সংমিশ্রণে যে-সব এনজাইম বা হজমী বাজারজাত করা হয় তাতে বিভিন্ন তরল পদার্থের সংমিশ্রণে হজমী ওষুধ কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। দেখা গেছে কয়েক দিন নয়, কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানেও এটা ঘটে থাকে।

এখন হিসাব করে দেখা যাক, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এসব হজমী ওষুধের স্থান কোথায়।

প্রথমত, অনেক ক্ষেত্রে বদহজমের প্রথম এবং প্রধান কারণ অতি ভোজন কিংবা অনিয়মিত ভোজন কিংবা গুরুপাক খাবার।

দ্বিতীয়ত, যে-সব কারণে বদহজম হয়, সেগুলোর চিকিৎসা হচ্ছে তার কারণ নির্ণয় ও প্রতিকারের ব্যবস্থা। বিভিন্ন ধরণের বিশেষ বিশেষ ব্যাধি যেমন পাকস্থলীর প্রদাহ অথবা আলসারজাতীয় রোগ সুনির্দিষ্ট চিকিৎসার মাধ্যমে আরোগ্য লাভ করে, হজমী ওষুধের মাধ্যমে নয়।

তৃতীয়ত, বিশেষ কোন এনজাইমের অভাব হেতু যে বদহজমের সৃষ্টি হয় তা দুইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যেমন পেনক্রিয়াসের প্রদাহ এবং লেকটেইজের অভাব।

চতুর্থত, তরল ওষুধ যা শিশি হিসাবে বাজারজাত করা হয়, তাতে রাসায়নিক ক্রিয়ার মাধ্যমে হজমী ওষুধের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়।

পঞ্চমত, যে দুটো কারণে এনজাইম অতি প্রয়োজন, সে দুটো কারণ নির্ধারিত হবার পর প্রয়োজন উপযুক্ত পরিমাণ এনজাইম এক্সট্রাক্ট পাউডারের আকারে কেপসুল হিসেবে সেবন।

উপরে উল্লিখিত তথ্য থেকে বোঝা যায় তথাকথিত ওষুধের ব্যবহার প্রয়োজনের চেয়ে অপ্রয়োজনেই বেশি। প্রায় সব ক্ষেত্রেই এগুলো ব্যবহারের কোন যৌক্তিকতা নেই। প্রচলিত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে উপশমের আশায় দিনের পর দিন হজমী ওষুধ খেয়ে শুধু অর্থের অপচয় হয় না, সংকটেরও সৃষ্টি হতে পারে। আগেই বলা হয়েছে খাওয়াদাওয়ায় অনিয়ম থেকে শুরু করে পাকস্থলীর জটিল রোগ যেমন ক্যান্সার-এর যে কোন একটি হজমের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। ব্যক্তি বিশেষের শেষোক্ত কারণে যদি হজমের ব্যাঘাত ঘটে এবং উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া হজমী ওষুধ খেয়ে সময় নষ্ট করে, তাহলে বিপদ অনিবার্য। আসল রোগের বিস্তৃতি

হজমী ওষুধ রোধ করবে না, করতে পারে না। শুরুতে এই রোগ নিরাময়ের যে সম্ভাবনা থাকে, তা ক্রমশই লোপ পায়। পরবর্তী পর্যায়ে এই জটিল রোগ যখন এর জটিলতা এবং লক্ষণসমূহের মধ্যে প্রকাশ পায়, তখন আর করার কিছুই থাকে না। চিকিৎসক সেখানে নিরুপায়। রোগ হয়ত শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তখন বিস্তৃত। এহেন করুণ পরিণতির অন্যতম প্রধান কারণ বদহজমের প্রতি অবহেলা এবং তথাকথিত হজমী ওষুধের প্রতি নির্ভরশীলতা এবং ভালবাসা। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে যে ওষুধের কোন কার্যকারিতা নেই, অন্ধ বিশ্বাসের ফলে বাজারে তা বহুল প্রচলিত। এহেন অন্ধ বিশ্বাসের মূলে রয়েছে বিভিন্ন আকর্ষনীয় বিজ্ঞাপন ও প্রচার এবং কিছুসংখ্যক চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র। কত খরচ হয় তার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় যখন আমরা দেখি কোন কোন কোম্পানী শুধু এই ওষুধ বানিয়ে ব্যবসায় প্রসার লাভ করেছে। প্রয়োজনীয় ওষুধ তৈরীতে এরা আগ্রহী নয়। এদের উদ্দেশ্য রোগের উপশম নয়, ব্যবসার লাভের অংক। আসল কথা জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা আমাদেরই দায়িত্ব। তাদের জানাতে হবে হজমী ওষুধ বদহজমের প্রতিকার নয়, টাকা হজমের একটা মাধ্যম। এগুলো বদহজমের উপশম করে না, সংকটের সৃষ্টি করে।

জোলাপে যন্ত্রণা

তখন আমি কোলকাতা মেডিকেল কলেজে প্রথম বর্ষের ছাত্র। ডাক্তারী বিদ্যার বড় বড় বই, বিশাল আকারের হাজার পৃষ্ঠাসম্বলিত গ্রে-র এনাটমী, স্টার্লিং-এর ফিজিওলজী প্রথম দৃষ্টিতে কেমন একটা ভীতির সঞ্চার করেছিল, তা আজও মনে পড়ে। ডিসেকশন হলে প্রথম প্রবেশ। সারি-সারি মৃতদেহ এখানে-সেখানে কাটা অবস্থায়। এমনি একটা শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ, তার ওপর প্রিজারভেটিভ (সংরক্ষণকারী) হিসাবে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের কেমন একটা গন্ধ। মনে হয়েছিল যেন গোটা পরিবেশটাই শুধু অস্বস্তিকর নয়, অস্বাস্থ্যকরও বটে। ক্রমে ক্রমে নিজেকে সামলে নিয়েছিলাম। কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেল শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। দিনভর যেন মাথা ধরে থাকে, গা-হাত নিশপিশ করে, ক্ষুধা মান্দ্য, একটা বিরক্তিকর ভাব, কিছু কিছু ঘুমের ব্যাঘাত। ৬৩ নং তালতলা লেনে বড় ভাই মোহাম্মদ আছহাবের সাথে মেসে থাকতাম। পড়াশুনা করতাম ছাদের সিঁড়ি ঘরে একটা ছোট কামরায়। বিজলী বাতির ব্যবস্থাও ছিল না। হারিকেন জ্বালিয়ে পড়াশুনা করতাম।

সে যাই হোক, মেসে বড় ভাইয়ের বড় শ্যালক সিরাজুল হক খান সহ আরও সাত-আট জন লোক থাকতেন। তাদের চোখে আমি ছোট ভাইয়ের মত ছিলাম। একটু দূরে ১৬ নং ওয়েলেসলী স্কোয়ারে পিতৃতুল্য মামা ইকবালুর রহমান সাহেব থাকতেন। তিনি ছিলেন ইনকাম ট্যাক্সের একজন অফিসার। বড়ভাই এবং মামার সম্পর্ক ছিল অকৃত্রিম ভালবাসার। বড়ভাই ছিলেন শম্ভুনাথ হাসপাতালের হেড ক্লার্ক। প্রায় সব কিছুতেই তারা পরামর্শ করতেন। দুজনেই বেশ কয়েক বছর আগে আমাদের থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন।

আমার অসুখের কথা শুনে বড়ভাই উপদেশ দিলেন মামার পরামর্শ নিয়ে কোন ডাক্তার দেখাতে হবে।

বিকেলবেলায় অন্য দিনের মত মামার বাসায় গেলাম। তিনি কুশল জানতে চাইলে বললাম, শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছে না। বড়ভাই বলেছেন আপনার পরামর্শ নিয়ে কোন ডাক্তার দেখাতে। একটুখানি তিরস্কারের সুরে মামা বললেন, এত অল্প বয়সে তোমাদের অসুখ হয়। ঠিক করা হল পরের দিন সন্ধ্যাবেলা তিনি আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবেন। আমি যেন যথাসময়ে আসি।

কলেজে সেদিনের পড়াশুনা শেষ করে মেসে গিয়ে আমি হাত-মুখ ধুয়ে নির্ধারিত

সময়ে মামার বাসায় হাজির হই। মাগরিবের নামাজ পড়ে মামা আমাকে নিয়ে গেলেন তালতলায় ডাঃ তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। মামাকে দেখে ডাক্তারসাহেব অভ্যর্থনা জানিয়ে কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। জানতে চাইলেন আমি কে। পরিচয় নিয়ে তিনি আমাদের বসতে দিলেন। জানতে চাইলেন আমার অসুবিধা কি। একে-একে সব লক্ষণগুলো বললাম। শেষটায় এও জানিয়ে দিলাম অনেকে পরামর্শ দিয়েছে পায়খানা যদি পরিষ্কার হয়, সব সেরে যাবে। সে জন্য আমি এগারল খেতে পারি। ডাক্তারবাবু অতি মনোযোগের সাথে সব শুনলেন। আমাকে পরীক্ষা করলেন। আস্তে আস্তে চেয়ারে এসে বসে একটুখানি চুপ থেকে বললেন, তুমি কি ওষুধ খেতে চাও? উত্তরে বললাম, অনুমতি দিলে এগারল খেতে পারি। তিনি মুচকি হাসলেন। বললেন, হ্যাঁ। খেতে পার, এখন তোমার জীবনের শুরু। রাত্রে যদি এক চামচ করে খেতে শুরু কর, হয়ত পায়খানা হবে। শেষে এমন এক সময় আসবে যখন এক চামচে চলবে না, এক বালতি খেতে হবে। এটাই হল জোলাপের নিয়ম। প্রথমে অল্পে হয়। আর শেষে লাগে ঢের বেশী। তরিতরকারী যত পার খাও। সকালে ঘুম থেকে উঠে এক গ্লাস জল খাবে, এতেই পায়খানা পরিষ্কার হবে। তোমার বর্তমান সমস্ত অসুবিধা আস্তে আস্তে সেরে যাবে।

মামা নির্দেশ দিলেন ডাক্তার সাহেবের পরামর্শ মত কাজ করতে। তা মেনে নিলাম। এরপর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় শিক্ষা বর্ষে ফার্মাকোলজিতে বিভিন্ন ধরণের জোলাপ এবং তাদের কার্যকারিতা জানার সুযোগ ঘটে। তালিকায় এইগুলোর নাম অনেক—কেষ্টরওয়েল থেকে কেসকেরা, মেগসালফ আরও কত কি। শুধু বই-পুস্তক থেকে পরীক্ষা পাশের তাগিদে এগুলো জানাই সার। কোনদিন ব্যবহার করিনি। ১৯৫১ সালে এম. বি. পাশ করার পরবর্তী বৎসর অর্থাৎ ১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এসে চাকুরীতে যোগদান করি। ১৯৫৪ সালে উচ্চ শিক্ষার্থে যুক্তরাজ্য যাবার সুযোগ ঘটে। এই সময়ে এডিনবরা রয়াল কলেজে জোলাপের উপর একটা আলোচনা সভা হয়। একজন অভিজ্ঞ অধ্যাপক এই সভা পরিচালনা করেন। বিভিন্ন দেশের পোস্ট গ্রাজুয়েট ছাত্র-ছাত্রীরা এতে অংশ নেন। সব মিলে প্রায় সাড়ে তিনশ জন। অনেকক্ষণ ধরে জোলাপের বিভিন্ন দিকের ওপর আলোচনা করার পর অভিজ্ঞ অধ্যাপকসাহেব মন্তব্য করলেন, 'মোটামুটিভাবে ধরতে গেলে এগুলোর কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। খাওয়া-দাওয়া এবং অভ্যাসের মাধ্যমে পাকস্থলীর কার্যক্রম অনেকটা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। ক্ষমতা থাকলে আমি হয়ত বিভিন্ন ধরণের জোলাপ নিষিদ্ধ করে দিতাম।' ডাঃ তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা মনে পড়ে গেল। কলকাতার একটা গলি থেকে আট-নয় বৎসর আগে জোলাপ সম্বন্ধে তিনি যে উপদেশ রেখেছিলেন, উন্নত পশ্চিমা দেশ যুক্তরাজ্যের চিকিৎসা শিক্ষার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র এডিনবরায় এতদিন পরে যেন তার প্রতিধ্বনি শুনতে পেলাম। আত্মতৃপ্তি লাভ করলাম। সেই সময়ে জীবনের শুরুতে সৎ উপদেশ না পেলে এতদিন আমিও হয়ত এগারলের পিছনে অনেক টাকা অহেতুক খরচ করতাম। লাভ হত কোম্পানীর, আর শারীরিক ক্ষতি হত আমার।

কলকাতার সেই ডাক্তার আর এডিনবরার সেই অধ্যাপক দুয়ের মাঝখানে বেশ কয়েক বৎসর, তারপরও দু-যুগের বেশী কেটে গেল ; জোলাপ এখনও বহুল প্রচলিত। একটুখানি তলিয়ে দেখলে এর উত্তর মেলে। এখনও অনেকের ধারণা সপ্তাহে একবার যদি জোলাপ খাওয়া যায়, শরীরের সমস্ত বিষ তরল পায়খানার সাথে বেরিয়ে যাবে। এ বিশ্বাসের সূত্রপাত কখন হয়েছিল জানা নেই। তবুও মোটামুটিভাবে নিঃসন্দেহে বলা যায়, প্রস্তুতকারক কোম্পানীগুলো এ দাবী করেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে জোলাপ বাজারজাত করেছে। তারই ফলশ্রুতি এই অন্ধ বিশ্বাস। ট্র্যাডিশন সমানেই চলেছে। এখনও বিভিন্ন প্রচারপত্রে, দৈনিকে, সাপ্তাহিকে সুন্দর করে লেখা হয় 'একদিনের জোলাপ আপনাকে গোটা সপ্তাহের আরাম দেবে।' পায়খানা পরিষ্কার না হলে শরীরে নানা ধরনের ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ রক্তে সঞ্চিত হয় বলে অনেকের ধারণা। তাদের মতে এরই ফলে অনেক লক্ষণ দেখা দেয়। এমন একটা ধারণা নিতান্ত কাল্পনিক। এর কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই।

বহুদিন জোলাপ ব্যবহারের ফলে শরীরে নানা রকমের উপসর্গ দেখা দিতে পারে। জোলাপের জন্য পাতলা পায়খানার ফলে শরীর থেকে বিভিন্ন কার্যকরী উপাদান নিঃসৃত হয়—সোডিয়াম এবং পটাসিয়াম এদের অন্যতম। এগুলো ছাড়া শরীরের প্রোটিন এবং ক্যালসিয়ামের পরিমাণও কমে যায়। ফলে সংশ্লিষ্ট নানান ধরনের লক্ষণ দেখা দেয়। পটাসিয়াম ঘাটতির ফলে দুর্বলতা দেখা দেয়। পাকস্থলীর সঙ্কোচন-সম্প্রসারণ ক্ষমতা কমে যায়। বায়ু জমে, কোষ্ঠ্য কাঠিন্য দেখা দেয়। এ অবস্থায় জোলাপ ব্যবহার করার ফলে এই সমস্ত উপসর্গের উপশম না হয়ে জটিলতা বাড়ে। প্রোটিন এবং ক্যালসিয়াম ঘাটতির ফলে অস্থি-মাংস দুর্বল হয়ে পড়ে, এমন কি, কোন-কোন ক্ষেত্রে মেরুদণ্ডের কোন কোন অস্থির স্বাভাবিক আকার বদলে পাতলা চেপ্টা হয়ে যেতে পারে—যাকে মাছের হাড়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

অনেক দিন জোলাপ ব্যবহার করার পর একটা নির্ভরশীলতা জন্মায়। জোলাপ ছাড়া তখন আর শরীর-পদ্ধতি কাজ করতে চায় না। অর্থাৎ পায়খানা হয় না। দুই-এক দিন পায়খানা না হলেই মনে হয় শরীরের বিষক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পায়। জোলাপ ব্যবহার করার পর বিশ্বাসের বশে অভ্যস্ত লোক স্বস্তি বোধ করে। এমনি করে দিনের পর দিন জোলাপ খাওয়ার অভ্যাস একটা দৈনন্দিন ব্যাপারে পরিণত হয়। শোবার আগে জোলাপ একটি নিয়ম হয়ে বসে।

আগে বলা হয়েছে, জোলাপ নানা প্রকারের শরীরের পক্ষে উপকারী রাসানিক দ্রব্যাদির ঘাটতি করতে পারে। যেহেতু জোলাপ খেলে কৃত্রিম উপায়ে এক ধরনের ডাইরিয়া বা পাতলা পায়খানা হয়, অন্ত্রের শোষণ ক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে, ফলে অনেক রকমের ভিটামিনের অভাব শরীরে দেখা দেয় এবং তৎসংলগ্ন লক্ষণ প্রকাশ পায়।

বাংলাদেশের দরিদ্র জনগণের পক্ষে এটা একটা দুঃখজনক ব্যাপার। সুষম খাদ্য বা পুষ্টির অভাব এখানে প্রায় সর্বস্তরে। আবার এদিকে জোলাপ ব্যবহারের বদ অভ্যাসের কারণে খাদ্যের শোষণ কাজে ব্যাঘাত ঘটে। ফলে এই সীমিত বা নিম্নমানের

খাবারের অনেকটা যদি জোলাপের কারণে দেহের পুষ্টি সাধনে ব্যর্থ হয়, তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় অনেকটা যেন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা-এর মত।

দীর্ঘদিন ধরে জোলাপ ব্যবহারের কি কুফল তা অনেকেই জানেন না। এর জন্য কে বা কারা দায়ী সেটা আমার বিচার্য নয়। তবে এর কুফল সম্বন্ধে সবাইকে অবহিত করা একটা নৈতিক এবং সামাজিক দায়িত্ব।

নিজ-নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা যদি অতীতের অনেক ঘটনার উপর আলোকপাত করি তাহলে জোলাপের জটিলতার অনেক উদাহরণ পাওয়া যেতে পারে। হঠাৎ পেটে ব্যথা আরম্ভ হবার সাথে সাথে পায়খানা পরিষ্কার হয়নি বলে জোলাপ খাইয়ে দেওয়ায় জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে। এই ধরনের লক্ষণ নানা কারণে হতে পারে। এপেন্ডিসাইটিস এগুলোর অন্যতম। নাভির চার পাশে ব্যথা শুরু হয়ে তলপেটের ডানদিকে এর বিস্তৃতি, কোষ্ঠকাঠিন্য, সামান্য জ্বর এপেনডিসাইটিসের বিশেষ কয়েকটি লক্ষণ। রোগ নির্ণয় না করে পায়খানা হলে সব সেরে যাবে এই ভেবে তাড়াহুড়ো করে এখানে জোলাপের ব্যবহার রোগীর সাংঘাতিক পরিণতি ডেকে আনতে পারে। জোলাপের পর খাদ্যনালীর সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচন বৃদ্ধির ফলে প্রদাহযুক্ত এপেনডিকস ছিড়ে যেতে পারে। এতে জীবন অনেকটা বিপন্ন হয়। এ রকম ভুলের ফলে আমরা কত লোককে হারিয়েছি তার হিসেব দেয়া যাবে না। তবে এমন ঘটনা যে ঘটেছে তা অনেকের অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করা যেতে পারে। শুধু এপেনডিসাইটিস নয়, খাদ্যান্ত্রের আরও বহু প্রকার অসুখ বিশেষ করে যেগুলো হঠাৎ পেটে বেদনা নিয়ে আরম্ভ হয়, যেগুলোর সাথে উচ্চ কিংবা মধ্যম তাপমাত্রা থাকে, সেগুলোতে জোলাপের ব্যবহার রোগের জটিলতা সৃষ্টির সহায়ক। অন্যদিকে বিশেষ করে বয়স্ক লোকদের বেলায় দেখা গেছে তৈলজাতীয় জোলাপের ব্যবহারে ফুসফুসে এক ধরণের নিউমোনিয়া হতে পারে। জোলাপ খেয়ে রাত্রে শোবার পর তৈলাক্ত জোলাপের সামান্য কিছু যদি শ্বাসনালী দিয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করে, সেখানে এক ধরনের প্রদাহের সৃষ্টি করে যা নিউমোনিয়াতে পরিণত হয়। অন্যদিকে এ ধরনের জোলাপ অনেক সময় পায়খানার রাস্তা দিয়ে অল্প অল্প বেরিয়ে এসে একটা অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করে, পায়খানার রাস্তার চারপাশে অস্বস্তির ফলে চুলকাতে থাকে।

এককালে গর্ভধারণের প্রারম্ভিক অবস্থায় জোলাপ ব্যবহারের ফলে ভ্রূণ নষ্ট হয়েছে এমন উদাহরণও মেলে।

বহুদিন ধরে জোলাপ ব্যবহারের ফলে অন্ত্রের স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি হতে পারে। মায়েণ্টারিক প্লেক্সাস নামের স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারিতা নষ্ট হয় বলে অন্ত্রের গতিতে ব্যাঘাত ঘটে এবং সে কারণে জোলাপের মাত্রা পরবর্তী পর্যায়ে অনেক বাড়িয়ে দিতে হয়। বিভিন্ন রকমের জোলাপের এই সমস্ত সাধারণ উপসর্গ ছাড়াও বিশেষ উপসর্গ দেখা যেতে পারে। কোন-কোন জোলাপ অন্য ওষুধের কার্য ক্ষমতা ব্যাহত করে। আর কোন-কোন জোলাপ মাংসপেশীর দুর্বলতা, এমনকি, চিন্তাশক্তিও ব্যাহত করতে পারে। আর কতকগুলো জোলাপ যা এক সময় স্বাস্থ্যবর্ধক নামে পরিচিত ছিল পরবর্তী সময়ে

দেখা গেছে সেগ্নলো লিভারের জন্য বেশ ক্ষতিকারক। অতএব স্বীকার করতে হবে জোলাপ ব্যবহার নিরাপদ নয়। প্রশ্ন উঠতে পারে এগ্নলো না হলে চলে কি না। মোটাম্নটিভাবে ধরে নেয়া যায় জোলাপের তেমন কোন প্রয়োজন নেই। অন্ধ বিশ্বাসের বশেই এগ্নলো বহ্নল প্রচলিত।

কোম্পানীর আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন এবং শোনা কথা জনসাধারণকে কিভাবে বিভ্রান্ত করতে পারে জোলাপ তার একটা উদাহরণ। সপ্তাহে একদিন জোলাপ নিলে বাকী দিনগ্নলি ভাল যাবে এ ধরনের বিশ্বাস বিজ্ঞাপন এবং প্রচারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। রীতিমত পায়খানা পরিষ্কার হওয়া একটা অভ্যাসের উপর নির্ভরশীল। এটা খাবার জিনিসের উপর অনেকটা নির্ভর করে। পায়খানা পরিষ্কার না হলে ক্ষতি হবে এই ধারণা নিয়ে চিন্তিত মনে কেউ যদি পায়খানা করতে যান, তার পায়খানা পরিষ্কার না হওয়াই স্বাভাবিক। যেমন ঘ্নম হবে না এই চিন্তা নিয়ে যারা ঘ্নমাতে যান, তাদের সহজে ঘ্নম আসে না। পাকস্থলীর ওপর মানসিক প্রক্রিয়ার প্রভাব অনেকেই অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারবেন। যেখানে পায়খানা বা প্রস্রাবের ব্যবস্থা নেই, সেখানে এগ্নলোর প্রয়োজনীয়তা অন্নভূত হয় বেশী, বিশেষ করে যাদের মানসিক দ্নর্বলতা থাকে বা অহেতুক ভয় থাকে।

আবার অন্যদিকে দ্নষ্টি ফিরালে কয়েকটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। গর্ন, ভেড়া, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি চত্নষ্পদ প্রাণী আদৌ কোষ্ঠ্যকাঠিন্যে ভোগে কিনা সন্দেহ। অন্ত্রে বিশেষ কোন রোগ হলে আমাদের মত এ-সমস্ত তৃণভোজী প্রাণীরও কোষ্ঠকাঠিন্য হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আমাদের আলোচ্য বিষয় অহেত্নক জোলাপের ব্যবহার। যেখানে কোষ্ঠকাঠিন্য বিশেষ কোন রোগের কারণে হয়ে থাকে, সেখানে এ কারণ দ্নরীভূত করাই বাঞ্ছনীয়। যে-সব তৃণভুক্ জীবজন্ত্নর কথা বলা হল তাদের কোষ্ঠকাঠিন্য হয় না কেন তা তলিয়ে দেখতে হবে। এরা খায় কি? এরা গাছগাছড়া, লতাপাতা, ঘাস, ইত্যাদি খায়। মোট কথা আঁশজাতীয় খাদ্যই তাদের ম্নল উপাদান। সেজন্যই এইসমস্ত প্রাণীর মলত্যাগ একটা নিয়মিত ব্যাপার। এ ধরনের অভ্যাস এক কালে পাহাড়ীয়াদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। অর্থাভাবে হউক কিংবা প্রচলিত অভ্যাসের বশেই হউক গ্রামের লোকেরা শাক-সবজী বেশী খেয়ে থাকেন। যার ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য তেমন দেখা যায় না। স্নতরাং জোলাপের ব্যবহার তাদের অনেকের কাছে অজানা। যত সমস্যা উচ্চ কিংবা অর্ধশিক্ষিত বা বিত্তশালী বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শহ্নরে লোকদের নিয়ে। এ সমস্ত ব্যক্তিরা অধিক পরিমাণ শাক-সবজি খাওয়াকে গরীবী খাবার বলে মনে করেন। অন্যদিকে আকর্ষণীয় কার্টুনে ভরা জোলাপের বোতল এদের অনেকের বাড়ীতে শোভা পায় এবং অনেকে আবার দামী জোলাপ নিয়ে গর্বও অন্নভব করেন। এদের দেখাদেখি শহরে স্বল্প আয়ের অনেক পরিবারেও জোলাপ ব্যবহারের প্রবণতা দেখা দেয়। এটা দ্নর্ভাগ্যজনক। যে বিশ্বাসের বশে জোলাপ আজকাল সমাজে প্রচলিত তার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। জোলাপ ব্যবহারের যে উপকারিতা দাবী করা হয়, তা নিছক সত্যের অপলাপ। আগেই বলা হয়েছে বেশী পরিমাণে আঁশজাতীয় খাবার

খাওয়ার অভ্যাস নিয়মিত মলত্যাগের অন্যতম সহায়ক। এ ছাড়া যে কয়েকটা জিনিস সস্তা, নিরাপদ এবং উপকারী সেগুলো হল ঈশবগুলের ভুষি, বেল, আনারস ইত্যাদি। রাতের বেলায় শোবার সময় ২/৩ চামচ ঈশবগুলের ভুষি জলের সাথে খেলে অতি সহজে পায়খানা পরিষ্কার হয়। এগুলো দামে সস্তা। ফ্যাশনের বশে অনেকে ঈশবগুলের ভুষির প্রতি অনীহা প্রকাশ করেন অথচ আইসোজেল খেয়ে তৃপ্ত পান। শেষোক্ত জিনিসটা আমাদের দেশী ঈশবগুলের বিলিতি সংস্করণ। দামে বেশী, সুন্দর কার্টনে ভর্তি, সবার উপরে এটা বিদেশে তৈরি, তাই এত কদর। বেলের দুর্ভাগ্য এটা দামে সস্তা, যদিও গোটা বছর ধরে এটা পাওয়া যায় না। শাক-সবজী ছাড়া বেশ কয়েকটি দেশীয় ফলমূলে পায়খানা পরিষ্কার হয়, এতে কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় না। কারণ কখনও বেল, কখনও আনারস, কখনও আম, আবার কখনও বা অন্য কিছু গোটা বছর জুড়ে থাকে। এ ছাড়া শাক-সবজী তো আছেই। ঈশবগুলের অভাব এখনও দেখা যায়নি। তাহলে জোলাপের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? যে জোলাপ শরীরে বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, প্রয়োজনীয় উপাদানের ঘাটতি ঘটায়, অন্ত্রের স্নায়ুর দুর্বলতা আনে, এমন কি, কোন-কোন সময় মারাত্মক পরিণতির সৃষ্টি করতে পারে, সে জোলাপে সান্ত্বনা নয়, বরং যন্ত্রণা।

আমাশয়ে অমানিশা

ডিসেন্ট্রি বা আমাশয় একটা অতি পরিচিত শব্দ। এটা এক বা একাধিক রোগের নাম। এ-রোগে আক্রান্তের হার অত্যন্ত ব্যাপক। পুনঃ পুনঃ শ্লেষ্মা এবং কম-বেশী রক্তযুক্ত পায়খানা এ-রোগের প্রধান লক্ষণ।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বর্তমান নিবন্ধে ব্যাসিলারী ডিসেন্ট্রি বা সিগেলা নামক জীবাণুজনিত আমাশয়ের কথা নয়, আমরা আলোচনা করব এমিবিক ডিসেন্ট্রি বা এমিবাজনিত আমাশয়ের কথা।

সাধারণভাবে বলা যায়, সিগেলা জীবাণুজনিত আমাশয়ের ক্ষেত্রে পনের-বিশ বার থেকে ত্রিশ-চল্লিশ বার পর্যন্ত পায়খানা হওয়া স্বাভাবিক। মলের তুলনায় অধিক পরিমাণ রক্ত এবং পায়খানার রাস্তায় শূল এবং জ্বর এ-ধরনের আমাশয়ের বিশেষ লক্ষণ। এ-ধরনের আমাশয় ক্ষণস্থায়ী এবং তুলনামূলকভাবে এতে কম সমস্যার সৃষ্টি হয়। এমিবিক আমাশয় সম্পর্কে বলা যায় এটা হচ্ছে একটা জাতীয় সমস্যা।

অনেকেই স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে নিজেদের এমিবিক আমাশয়ের রুগী বলে মনে করেন। এবং আপন ব্যবস্থামত ঔষুধ সেবনে ব্রতী হন। এ-থেকে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে এ-ধরনের রোগে ওষুধের চাহিদা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী। বাংলাদেশের বাজারে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন ধরণের ওষুধ অথবা একই ওষুধ বিভিন্ন নামে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া অনেকেই যখন-তখন এ-সব ওষুধ ব্যবহার করে থাকেন।

মাসের পর মাস, এমন কি, বৎসরাধিককাল ধরেও এ ওষুধ ব্যবহার করে আসছেন, এমন লোকের সংখ্যা অজানা হলেও নগণ্য বলা ঠিক হবে না। প্রশ্ন হল, পায়খানার সাথে সামান্য আম অথবা মাঝে-মাঝে রক্ত পেলেই কি সেটাকে সন্দেহাতীতভাবে আমাশয় বলে ধরে নিতে হবে?

আমার পরিষ্কার জবাব হচ্ছে—না।

এ-ধরনের উপসর্গকে আমাশয় বলে ধরে নেয়া শুধু যে অবৈজ্ঞানিক তাই নয় অনেক ক্ষেত্রে বিপদজনক। বিশেষ করে বয়স্ক লোকের এ-ধরনের লক্ষণ যদি স্বল্পকালীন হয়, তাহলে তার অন্য কোন জটিল রোগ আছে কিনা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিঃসন্দেহ হওয়া অত্যাবশ্যক।

অন্যদিকে এ-ধরনের লক্ষণ অল্প বয়সীদের মধ্যে যখন মাসাধিককাল ধরে বার বার দেখা দিতে থাকে, তখন সেটা আমাশয় না হয়ে ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম (Irritable bowel syndrome) নামে ভিন্ন ধরনের একটা রোগও হতে পারে। দুটোর

চিকিৎসা সম্পূর্ণ ভিন্ন। উপরন্তু শেষোক্ত রোগটার নাম জটিল হলেও তাতে তেমন কোন জটিলতা দেখা দেয় না।

এ-আলোচনার মাধ্যমে যে বিষয়টির ওপর আলোকপাত করতে চেণ্টা করেছি সেটা হল, যে-সব লক্ষণকে আমরা সরাসরি আমাশয় বলে মনে করি, সেগুলোর সব আমাশয় নয়। সুতরাং রোগ নির্ণয় যেখানে সঠিক নয়, চিকিৎসাও সেখানে বিজ্ঞানসম্মত হতে পারে না। আরও প্রশ্ন আছে। পছন্দ মত ওষুধ ক্রয় করে ইচ্ছেমত সেবন করা কি আদৌ নিরাপদ? বাজারে বিভিন্ন ধরনের আমাশয়ের ওষুধ পাওয়া যায়। চাহিদার তুলনায় এ-সব ওষুধের পরিমাণ কম, এ-কথা মনে করার কোন কারণ নেই। প্রচলিত ওষুধের মধ্যে সেগুলো জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, তার কয়েকটা উদাহরণ এখানে তুলে ধরছি :

এন্টারোভায়োফরম, সাইয়োডো এনটারিন, মেক্সাফরম, এডাইসিন, ইনটেস্টোপেন, নিভেমবিন, এনটারোগুয়ানিডিন, এমবিকুইন ইত্যাদি।

এ-সব ওষুধ কতটুকু নিরাপদ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা করা সময়োচিত বলে মনে করি। নতুন জাতীয় ওষুধ নীতিতে ক্লিওকুইনল এবং হাইড্রোক্সিকুইনোলিন গ্রুপের কম-বেশী পঁয়ত্রিশটি ওষুধ ক্ষতিকর বলে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। এ নিষেধাজ্ঞার পিছনে বৈজ্ঞানিক যুক্তি রয়েছে।

ক্লিওকুইনল ও হাইড্রোক্সিকুইনলিন গ্রুপের যে-সব ওষুধ নিষিদ্ধ করা হয়েছে :

ওষুধের নাম	কোম্পানির নাম
স্টেরিকল	ফাইজার
ফিসট্রেপ টেবলেট	ফাইসন্স
এমবিকুইন	বি. পি. আই
নিভেমবিন	
কুইক্সালিন	স্কুইব
ডাইসেডিন	এডরুক
সাইওডোএনটারিন	এ্যালবার্ট ডেভিড
এন্টারোগুয়ানিডিন	
এডাইসিন	ফার্মাদেশ
আইডোকুইন	ফার্মাদেশ
এন্টারোসিল	গ্যাকো
ডাইরোকুইন	সিনথো ল্যাবরেটরীজ লিঃ
এন্টারোসাইড	ইউনাইটেড কেমিকেলস এণ্ড ফার্মাসিউটিকেলস লিঃ
অরাফুইনল	স্টানডার্ড ল্যাবরেটরীজ লিঃ
এসিকুইন	এশিয়াটিক ল্যাবরেটরীজ লিঃ
ডিওকুইন	ডক্টরস্ কেমিকেলস লিঃ

এনটেনল	সরমা কেমিকেলস ওয়ার্কস
রেসটোরেন কমপোজিটাস	বোক্সমকো
ডিপেনডাল	এস-কে-এণ্ড-এফ
এণ্টারোভায়োফরম	সিবা গেইগী
মেক্সাফরম	সিবা গেইগী
ইনটেসটোপেন	স্যানডজ
এণ্টারোসেপটল	ইজিট, হাঙ্গেরী

১৯৩০ সালে এই জাতীয় ওষুধের প্রথম আবির্ভাব। ১৯৩৪ সালে আমাশয় রোগের চিকিৎসায় এই ওষুধ প্রথম প্রয়োগ করা হয়। ভায়োফরম অথবা এন্টারো ভায়োফরম নামে বহু প্রচলিত ওষুধ সিবা গেইগী কোম্পানী বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বাজারজাত করে কি বিপুল মুনাফা অর্জন করেছে, তা সহজে অনুমেয়। ১৯৫০ সালের শেষের দিকে এ ধরনের ওষুধের বিষক্রিয়া প্রথম ধরা পড়ে কয়েকজন জাপানী চিকিৎসকের কাছে।

এসব ওষুধের দীর্ঘকালীন ব্যবহারের ফলশ্রুতিতে যেসব উপসর্গ দেখা দেয় তার মধ্যে আছে শরীরে ঝিন ঝিনা ভাব, অনুভূতি এবং চলৎশক্তি হ্রাস কিংবা বিলোপ। অনেক ক্ষেত্রে দৃষ্টিশক্তিও বিনষ্ট হয়। কালক্রমে জাপানে এ-ধরনের বিভিন্ন লক্ষণ-জনিত দশ হাজারেরও বেশী রুগীর নাম লিপিবদ্ধ করা হয়।

ব্যাপক সমীক্ষার পর ১৯৬০ সালের দিকে এইসব ক্ষতিকর উপসর্গের জন্য এন্টরোভায়োফরমকে দায়ী করা হয়। এই সময়ে অনেকেই এই ওষুধটাকে শুধু আমাশয় চিকিৎসার জন্য নয়, প্রতিরোধক হিসাবেও ব্যবহার করে চলেছিলেন।

১৯৭০ সালের গোড়ার দিকে জাপান সরকার এন্টারোভায়োফরম এবং একই জাতের ১৮৫টা ওষুধের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ১৯৭৯ সালে ক্ষতিপূরণ দাবী করে কোম্পানীর বিরুদ্ধে অনেকগুলো মামলা দায়ের করা হয়। শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং সরকার বিবাদী হিসাবে বিভিন্ন যুক্তি উত্থাপন করতে থাকে। উপরন্তু ওষুধজাত বিষক্রিয়া-গুলোকে তারা সরাসরি ভাইরাসজনিত বলে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করে। ১৯৭৬ সালে সিবা গেইগী কোম্পানী নিজেদের অসহায় অবস্থার কথাবিবেচনা করে একটা আপোষ মীমাংসার জন্য আদালতকে অনুরোধ জানায়। কোর্ট শেষ পর্যন্ত ৯৮ (আটানব্বই) কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত করে। এর এক তৃতীয়াংশ জাপান সরকারকে দিতে হয়। বাকী দুই-তৃতীয়াংশ প্রদান করে সিবা গেইগী এবং দুইটি জাপানী সংস্থা। সুইডেন এবং লন্ডনে এ-ধরনের ক্ষতিপূরণ মামলা দায়ের করা হয়। এত কর্মকান্ড সত্বেও তৃতীয় বিশ্বের ১০০টিরও অধিক দেশে এই-জাতীয় ওষুধ আজও অবাধে বিক্রয় হচ্ছে।

আমেরিকার স্কুইব কোম্পানীর বিরুদ্ধে একইজাতীয় ওষুধ কুইকসোলিনের জন্য মামলা দায়ের করা হয়। ক্লিওকুইনল গ্রুপের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যা আগে উল্লেখ করা

হয়েছে তা SMON (Sub-acute Myelo-optic Nuropathy) অর্থাৎ স্নায়ু তন্ত্রের রোগ নামে পরিচিত এবং এই রোগের লক্ষণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রিপোর্ট উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন নরওয়ে, ডেনমার্ক, সুইডেন মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ফ্রান্স, ইতালী ইত্যাদি। বাংলাদেশের ঝিন ঝিনা রোগ মাঝে-মাঝে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। মাত্র কিছুদিন আগেও এ-ধরনের রোগের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই রোগাক্রান্তদের মধ্যে অনেকেই যে আমাশয়জনিত ওষুধের শিকার, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। আমাশয় সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা বাংলাদেশের জনমনে এত ব্যাপক যে কোন উন্নত দেশে এর কোন বাস্তব দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না।

নিজে-নিজে ডাক্তারী করে ওষুধ খাবার প্রবনতা তৃতীয় বিশ্বে তথা বাংলাদেশে একটা সাধারণ ঘটনা। অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত সহজ সরল জনসাধারণের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে দেশী এবং বিদেশী কোম্পানী কত ক্ষতিকর এবং তথাকথিত আমাশয়ের ওষুধ বাজারজাত করেছে, এর উদাহরণ দেয়াই বাহুল্য। অন্ধত্ব, ঝিন ঝিনা কিংবা পক্ষাঘাত যাই হোক না কেন এদেশের জনসাধারণ সেটাকে কপালের লিখন বলে মেনে নেয়। তথাকথিত ওষুধকে সনাক্ত করে ক্ষতিপূরণ দাবী করা তাদের কল্পনার বাইরে। স্কুইব কোম্পানী এবং আরও বহু ওষুধ কোম্পানী এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ সজাগ। নিজের দেশে যেটা নিষেধ যেমন কুইকসালিন, বাংলাদেশে তা বাজারজাত করতে তাদের কোন দ্বিধা নেই। এর ফলে এ দেশের কত লোক বিষক্রিয়ার শিকার হচ্ছে তার হিসাব কে রাখে?

বাংলাদেশের জাতীয় ওষুধনীতিতে এ-সব তথাকথিত ক্ষতিকারক ওষুধগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বিকল্প হিসাবে আমাশয় রোগের কার্যকর এবং স্বল্পমূল্যের অনেক ওষুধ সব সময় বাজারে পাওয়া যায়।

সঠিক রোগ নিরূপণ করে চিকিৎসা করা এমন কোন কঠিন কাজ নয়। রোগ নিরূপণই চিকিৎসায় সাফল্যের প্রথম ধাপ। যখন তখন এনটারোভায়োফরম, কুইকসালিন, মেক্সাফরম অথবা এ-জাতীয় ওষুধ সেবন আমাশয়ের চিকিৎসা নয় বরং ঘোর অমানিশা।

গর্ভবতী মায়ের জন্য

একদিকে যেমন নতুন-নতুন ওষুধের সংখ্যা বেড়ে চলেছে অন্যদিকে তেমনি নতুন-নতুন রোগের আবির্ভাব হচ্ছে। অনেকে হয়ত মনে করতে পারেন রোগ নির্ণয়ের নতুন-নতুন পদ্ধতি আবিস্কৃত হওয়ার ফলে অনেক রোগ এখন আমরা সঠিকভাবে নির্ণয়ে সক্ষম। এটা বহুলাংশে সত্য হলেও সম্পূর্ণভাবে নতুন রোগের আবির্ভাব অস্বীকার করা যায় না। বিভিন্ন কারণে এগুলোর উৎপত্তি হতে পারে। যে ওষুধ রোগ প্রতিকার বা উপশমের জন্য তৈরী সে ওষুধ কোন-কোন ক্ষেত্রে অসুখ সৃষ্টি করতে পারে।

কাজেই ওষুধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে চিকিৎসককে সদা-সর্বদা এই বিষয়ে অবশ্যই সজাগ থাকতে হয়। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল না থাকলে রুগীর জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হতে পারে।

এই প্রবন্ধে আমরা গর্ভাবস্থায় ওষুধের ব্যবহার সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করব। এককালে গর্ভবতী মা এবং ভ্রূণকে এককভাবে বিচার করা হত। অসুখ এবং ওষুধ দুটোর বেলায় এদেরকে আলাদাভাবে দেখা হত না। পরবর্তীকালে দেখা গেছে রুবেল বা জার্মান মিজেলস যেটা মোটামুটিভাবে অতি সাধারণ রোগ এবং সেরে যায়, গর্ভাবস্থায় প্রথম তিন মাসে কোন মহিলার এ-রোগ হলে শিশুর এক ধরনের হৃদরোগ হতে পারে।

সারাবিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী থেলিডোমাইড আপাতদৃষ্টিতে মায়ের পক্ষে ক্ষতিকর না হলেও গর্ভাবস্থায় এটা সেবনের ফলে শত শত বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হয়েছে। গর্ভাবস্থায় ওষুধ প্রয়োগে সতর্কীকরণ থেলিডোমাইড়ের কুফল আবিস্কারের ফলশ্রুতি। বিকলাঙ্গ কিংবা বিভিন্ন রোগ বা রোগসমষ্টি নিয়ে নবজাত শিশু যেন জন্ম গ্রহণ না করে মাতৃত্বের প্রত্যাশা যাতে প্রবঞ্চিত না হয়, সে-উদ্দেশ্য নিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে গর্ভাবস্থায় বিভিন্ন ওষুধের ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া অবহিত করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। বিভিন্ন ওষুধ প্রয়োগের কুফলের একটা তালিকা নিচে দেওয়া হয়েছে। যদিও এই তালিকা সম্পূর্ণ বলে দাবী করা যায় না, তবুও এটা অনেকাংশে সহায়ক হবে এই বিশ্বাস রেখেই প্রণয়ন করা হয়েছে। গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাসে যখন ভ্রূণের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গের বিকাশ হতে থাকে তখনই বিপজ্জনক সময়। আগে উল্লিখিত জার্মান মিজেলস গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাসে হলে শিশুর হৃদপিণ্ডে ত্রুটি হতে পারে। এই বিশেষ সময়ে বিভিন্ন ওষুধ প্রয়োগ করলে নানাবিধ কুফলও পরিলক্ষিত হয়।

গর্ভাবস্থায় ক্ষতিকর ওষুধের প্রয়োগের ফলে ভ্রূণের আকার-আকৃতিতে, গঠনে, স্নায়ুতন্ত্রে এমন কি পরিবর্তিতে মানসিক বিকাশেও বিকৃতি ঘটতে পারে। শুধু তাই নয়, এমন বহু ওষুধও আছে যা সেবনে গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের স্বাভাবিক গঠনপ্রনালী পরিবর্তিত হয়ে নানাবিধ বিকট আকৃতি বিশিষ্ট শিশুরও জন্ম ঘটাতে পারে।

পূর্বেই বলা হয়েছে এগুলো গর্ভাবস্থার প্রথম কয়েক মাসে হয়ে থাকে। পরবর্তী পর্যায়েও অনেক ওষুধের ক্ষেত্রে শিশু নিরাপদ নয়। প্রথম তিন মাসে যেমন ভ্রূণের বিকাশে বিঘ্ন ঘটায়, কুফল দেখা যায়, তেমনি পরবর্তী পর্যায়ে ভ্রূণের গঠিত অঙ্গ-প্রতঙ্গের উপর ওষুধের বিষক্রিয়ার ফলে নানা রকমের জটিলতা দেখা দিতে পারে। ওষুধ সেবনের পর প্লেসেণ্টার মাধ্যমে তা-গর্ভস্থ শিশুর শরীরে প্রবাহিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে মা এবং শিশুর রক্তে এ ওষুধের পরিমাণ প্রায় কাছাকাছি হয়ে পড়ে। অথচ এই ওষুধের নিষ্কাশন ক্ষমতা মায়ের তুলনায় শিশুর অনেক কম বলে রক্তে ওষুধের পরিমাণ দীর্ঘস্থায়ী হয়। ফলে বিভিন্ন দেহতন্ত্রে নানা ধরনের ব্যাঘাত ঘটে। মোটামুটি ভাবে গর্ভাবস্থায় ওষুধের বিষক্রিয়াকে দুভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটা টেরাটোজেনিক অর্থাৎ বিভিন্ন দেহতন্ত্র এবং অঙ্গ-প্রতঙ্গের গঠনে নানা ধরনের ত্রুটি দেখা দেয় এবং যা গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাসে কোন-কোন ওষুধ প্রয়োগে পরিলক্ষিত হয়।

আর দ্বিতীয়টা হল শিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং দেহতন্ত্র গঠনের পর অর্থাৎ পরবর্তী পর্যায়ে ওষুধ সেবনের ফলে রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে শিশুর দেহে বিভিন্ন বিষক্রিয়া। সব ওষুধে এ-সমস্ত কুফল পরিলক্ষিত হয় না। তবে অনেক ক্ষেত্রে এই কুফল প্রমাণিত হয়। আবার কোন-কোন ক্ষেত্রে এগুলো সন্দেহের অতীত নয়। আসল কথা হল গর্ভাবস্থায় যে ওষুধ নিঃসন্দেহে নিরাপদ নয়, সেগুলো ব্যবহার করা কিছুতেই উচিত নয়।

যে-সমস্ত সাধারণ ওষুধ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এবং প্রাণবিকৃতকরণ (টেরাটোজেনিক) করে বলে প্রমাণিত তার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা নীচে দেওয়া হলো :

ওষুধ	পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া	প্রাণবিকৃতকরণ (টেরাটোজেনিক)
১. জোলাপ জাতীয় ওষুধ :	অসময়ে জরায়ুর সঙ্কোচনের ফলে রক্তক্ষরণ এমন কি গর্ভপাতও হতে পারে	
২. সালফনামাইড (Sulphonamide) এবং এই জাতীয় ওষুধ :	গর্ভবস্থায় ভ্রূণের পান্ডুরোগ দেখা দিতে পারে	পান্ডুরোগের জন্যে এবং পরবর্তীকালে নবজাত শিশুর মগজেও মারাত্মক ক্ষতিসাধন করতে পারে

৩. ইন্‌ডেরাল (Inderal) উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ :	নবজাত শিশুর রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে যায় ও হৃদস্পন্দন মাত্রা কমে যেতে পারে	
৪. থায়াজাইড (Thiazide) প্রস্রাব বাড়ানোর ওষুধ :	রক্তের জলীয় অংশ কমে যায় ও মাতৃগর্ভে রক্ত প্রবাহ কমে যায়	নবজাতকের রক্তক্ষরণ হতে পারে
৫. উচ্চরক্তচাপে ব্যবহৃত ওষুধ : রিসারপিন (Reserpin)	নবজাতকের ঝিমুনী, নাক বন্ধ ভাব	
৬. কফ্‌ সিরাপ বা মিক্সচার (যার মধ্যে Iodine-জাতীয় অংশ রয়েছে :	নবজাতকের Thyroid hormone-এর স্বল্পতা	
৭. মৃগীরোগের ওষুধ : (Phenytoin, phenobarbitone)	নবজাতকের রক্তক্ষরণের প্রবণতা	জন্মগত বিকলাঙ্গতা
৮. এ্যাসপিরিন (Aspirin) জাতীয় ওষুধ : (Aspirin, Indomehacin, Naproxen)	নবজাতকের রক্ত-ক্ষরণের প্রবণতা ও পান্ডুরোগ। প্রসবকাল দীর্ঘায়িত হয় ও মায়ের রক্তক্ষরণ প্রবণতা (গর্ভকালীন শেষ কয়েক সপ্তাহ এই ওষুধ অবশ্যই পরিহার করা উচিত)	ফুসফুসে উচ্চ রক্তচাপের সৃষ্টি
৯. ঘুমের ওষুধ :	নবজাতকের শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যহত হয়, ঝিমুনী ও শারীরিক অসারতা	
১০. স্ট্রেপটোমাইসিন (Streptomycin)	মা ও নবজাতকের শ্রবণশক্তি কমে যায় ও শারীরিক ভারসাম্য রক্ষায় বিঘ্ন ঘটায়	শ্রবণশক্তি কমে যায়

১১. টেট্রাসাইক্লিন (Tetracycline) টেরামাইসিন-জাতীয় ওষুধ :	মায়ের যকৃতের ক্ষতি করে, শিশুদের দাঁতের রঙ বিকৃত করে	
১২. ক্লোরামফেনিকল (Chloramphenicol)	কোন-কোন নবজাতকের প্রাণ সংশয় দেখা দিতে পারে (Gray baby syndrome)	
১৩. ম্যালেরিয়ায় ব্যবহৃত ওষুধ : (Quinine, Primaquine, Pyrimethamine	নবজাতকের লোহিত-কণিকা ধ্বংস হতে পারে	বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হতে পারে
১৪. স্টেরয়েড (Steroid) যেমন Prednisolone ও এই জাতীয় ওষুধ	এড্রেনাল গ্রন্থির কার্যকারিতা হ্রাস পায়	
১৫. সেক্স হরমোন (Sex hormone)	নবজাত কন্যাশিশুর পুরুষ আকৃতির বহিঃপ্রকাশ এবং যৌননালীতে ক্যান্সার হতে পারে।	
১৬. জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি		নবজাতকের প্রাণবিকৃতকরণ করতে পারে

অতি প্রিয় অথচ অপ্রয়োজনীয়

বাজারে প্রায় সব দোকানে বেশ কয়েকটি ওষুধ প্রচুর পরিমাণে মজুদ থাকতে দেখা যায়। এগুলোর চাহিদা অনেক। তাই এত কদর। অন্ধ বিশ্বাসের ওপর এগুলোর ভিত্তি। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এগুলো নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়, এমন কি, কোন-কোন ক্ষেত্রে ক্ষতিকর। এখন এগুলো নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এ-ধরনের সবকটি ওষুধ লিপিবদ্ধ করে পর্যালোচনা করা এখানে সম্ভব নয় বলে কয়েকটি বাছাই করে নেয়া হল :

ডিজিপ্লেক্স

ভিটামিন বি-12 সহ বি-কমপেক্স ভিটামিন ও ডায়াসটেজ এনজাইমের সংমিশ্রণে এই ওষুধ প্রস্তুত করা হয়েছে। বিজ্ঞাপন ও প্রচারের ফলে এই ওষুধ বাজারে খুবই চালু। কিন্তু এই সমস্ত প্রচারে চিকিৎসক ও ক্রেতাদের ভুল তথ্য দেওয়া হয়। তরল অবস্থায় ডায়াসটেজ-এর স্থায়ীত্বকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে চ্যালেঞ্জ করার পর ডায়াসটেজ ট্যাবলেট আকারে দেওয়া শুরু হয়। তবে ট্যাবলেট অবস্থায়ও ডায়াসটেজ-এর কার্য-কারিতা প্রায়ই থাকে না। বিজ্ঞাপনে যে-সব দাবী করা হয় তার কোনটাই সঠিক বলে প্রমাণিত হয়নি। প্রস্তুতকারক ফাইসন্স কোম্পানীর নিজ দেশে ওষুধটি নিষিদ্ধ। অথচ এদেশে বাজারজাত করে এই অপ্রয়োজনীয় ওষুধ লাভের পাহাড় গড়ে তোলার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই ওষুধ নিয়মিত ব্যবহার ক্ষতিকর।

গ্রাইপ ওয়াটার

কিছুটা মদ, খাবার সোডা, শরবত ও সুগন্ধি-সহযোগে এই ওষুধ প্রস্তুত হয়। বিজ্ঞানীদের মতে বাচ্চাদের বৃহদান্ত্রের নার্ভগুলোর সাময়িক অপরিপূর্ণতার কারণে কখনো-কখনো বৃহদান্ত্রের অস্বস্তিকর নড়াচড়ার ফলে বাচ্চা কেঁদে ওঠে। বাচ্চা কোলে নিলে কান্না আপনিই থেমে যায়, এর জন্য ওষুধের প্রয়োজন নেই। এই ওষুধে খাবার সোডা থাকার কারণে নিয়মিত ব্যবহার করলে মিল্ক-এ্যালকালী সিনড্রোম, কিডনীর ক্ষতি ও প্রস্রাবের গন্ডগোল হতে পারে। অথচ চটকদার বিজ্ঞাপনের দ্বারা মা ও ডাক্তাররা এই ওষুধের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই ওষুধ একদিকে যেমন অপ্রয়োজনীয় ও অর্থ অপব্যয়কারী, অন্যদিকে এটা ক্ষতিকরও। ক্রেতাদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে এই ওষুধের মাধ্যমেও প্রচুর মুনাফা করা হচ্ছে।

মিনোলাড

এই ওষুধ গ্লিসারোফসফেট, খনিজ পদার্থ ও মাল্‌টি ভিটামিন সহযোগে প্রস্তুত। অপ্রয়োজনীয় পদার্থের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে অতিরিক্ত মূল্য নেওরা হয়। দেশী কোম্পানীকে বাজার থেকে সরিয়ে রাখার এটা একটা অপচেষ্টা।

ডেকাটোন ক্যাপসুল

ভিটামিন, লোহা, হরমোন ও এনজাইম সংমিশ্রণে এই ওষুধ তৈরী করা হয়েছে। হরমোন সংযোজনের ব্যাপারটাও অদ্ভুত, কারণ পুরুষ ও স্ত্রী—দুই জাতীয় হরমোনই দেওয়া হয়েছে। পুরুষেরা স্ত্রী হরমোন কেন খাবে এর কোন ব্যাখ্যা কোম্পানী দেয় না। এই সংমিশ্রণের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও নেই। লিঙ্গান্তর ঘটলে কে দায়ী হবে? ক্রেতা, চিকিৎসক না ওষুধ কোম্পানী? বাংলাদেশে ইদানীং এত লিঙ্গান্তর ঘটার জন্য এসব ওষুধের অবদান কতটুকু? লিঙ্গান্তর ঘটলে যে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হবে তার দায়িত্ব কি কোম্পানী নিতে রাজী আছে? ওষুধটি বৃদ্ধদের জন্য এবং যৌনশক্তি বাড়ায় বলে দাবী করা হয়, কিন্তু এর কার্যকারিতার কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। বরং স্ত্রী-হরমোন থাকাতে পুরুষের যৌনশক্তি আরও কমে যায়। পুরুষত্বহীনতা ও নির্বীর্যতা হতে পারে। এভাবে ফাঁকি দিয়ে মুনাফা উপার্জন করা নৈতিক হীনতার পরিচয়। কাজেই এই ওষুধটি শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়, অত্যন্ত ক্ষতিকরও বটে।

মিনাডেক্স সিরাপ

খনিজ পদার্থ ও বিভিন্ন ভিটামিনের সংযোগে প্রস্তুত এই ওষুধ অপ্রয়োজনীয়। অতিরিক্ত ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ শরীরের ক্ষতিসাধন করতে পারে। অথচ এই অতিরিক্ত এবং অপ্রয়োজনীয় পদার্থের জন্য ক্রেতাকে চড়া মূল্য দিতে হয়। ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের প্রয়োজন আমরা শাক-সব্‌জীর দ্বারাই মিটাতে পারি।

প্যারাপাইরিন ট্যাবলেট

বেদনা-নিবারক কয়েকটি উপাদানের সংযোজনে এই ওষুধ প্রস্তুত। বেদনা-নাশক যে-কোন একটি উপাদান যে কাজ করে, কয়েকটির সংমিশ্রণে তার কার্যকারিতা বাড়ে না। বরঞ্চ একাধিক রাসায়নিক পদার্থ সেবনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা অনেকগুণ বৃদ্ধি পায়।

নোভালজিন ট্যাবলেট

এই বেদনা-নাশক ওষুধের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার কথা এখন প্রমাণিত। এটি এতই ক্ষতিকর যে পৃথিবীর অধিকাংশ উন্নত দেশেই এটা নিষিদ্ধ। বাংলাদেশেও এটা আগে একবার নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এই ওষুধের বহু বিকল্প ওষুধ যেগুলোর নোভালজিনের মত বিষক্রিয়া নেই—বাজারে পাওয়া যায়।

ফেস্টাল ড্রাগিস

নানাপ্রকার এনজাইম ও অন্যান্য পদার্থের সংমিশ্রণে এই ওষুধ প্রস্তুত। এই ধরনের সংমিশ্রণ অপ্রয়োজনীয়। নিয়মিত ব্যবহার করলে স্বাভাবিক পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটায়, ওষুধটির ওপর নির্ভরশীলতা বাড়ায় এবং শরীরের পরিপাকতন্ত্রকে পঙ্গু করে। কোন-কোন অসুখে এই ওষুধের একটি উপাদান কাজে লাগতে পারে, সেজন্য অপ্রয়োজনীয় উপাদানগুলো বাদ দিয়ে নতুন ফর্মুলা জমা দিতে বলা হয়েছে।

মিক্রোজেন ট্যাবলেট

মেয়েদের ব্যবহারের জন্য হরমোনজাতীয় ওষুধ। প্রচুর অপব্যবহার করা হয়। অথচ অপব্যবহারে ক্যান্সার হতে পারে একথা প্রমাণিত। ওষুধটিতে পুরুষ হরমোন আছে। পুরুষ হরমোন ব্যবহার মেয়েদের জন্য ক্ষতিকর। এতে মেয়েদের শরীরে পুরুষালি লক্ষণ (ভিরিলাইজেশন) দেখা দিতে পারে, এমন কি, লিঙ্গান্তর পর্যন্ত ঘটতে পারে। ক্ষতিকর পুরুষ হরমোনটি বাদ দিয়ে নতুন ফর্মুলা জমা দিতে বলা হয়েছে।

ফেনসিডিল কফ লিঙ্কটাস

কাশির জন্য এই ওষুধ ব্যবহারের উপদেশ দেওয়া হয়, অথচ এর কার্যকারিতার কোন প্রমাণিত তথ্য নেই। এই ওষুধে নেশা উদ্রেককারী পদার্থ রয়েছে। নেশার জন্য এই ওষুধের ব্যবহার সুবিদিত।

বিকোস্কুলস ক্যাপস্থল/বিকোনেক্স সিরাপ

প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভিটামিন সংমিশ্রণে প্রস্তুত এই ওষুধের ব্যবহার সাধারণ মানুষের অর্থের অপব্যয়েরই নামান্তর।

বিকোনেক্স এচই. পি. ইনজেকশন

এতে বিভিন্ন ভিটামিনের অনাবশ্যক অধিক মাত্রা দেয়া আছে। অপ্রয়োজনীয় ওষুধ ও অকারণ অর্থের অপচয় ঘটায়।

ভিব্রামাইসিন সিরাপ

এই ওষুধ টেট্রাসাইক্লিন গ্রুপের। বাচ্চাদের জন্য অসম্ভব ক্ষতিকর এই ওষুধ। এই ওষুধ সেবনে বাচ্চাদের দাঁত ও নখ কালো হয়ে যেতে পারে এবং হাড় ও শরীরের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। টেট্রাসাইক্লিন জাতীয় ওষুধ গর্ভবতী মায়েদের খাওয়া নিষেধ। কারণ বিকলাঙ্গ বা দুই মাথা, তিন হাত ইত্যাদি ধরনের অদ্ভুত শিশু জন্ম নিতে পারে।

পলিটামিন টনিক

ওষুধের মোড়কে সবচেয়ে বেশী বিক্রিত মদগুলির একটি। এ-দেশে খাবার জলের

অভাবের কথা মনে করেই হয়ত কোম্পানী জলের বদলে মানুষকে মদ সেবন করায়। পালোয়ানের ছবি মোড়কে লাগিয়ে এই ওষুধ খেতে মানুষকে উৎসাহিত করা হয়। অথচ ওষুধ এই অজুহাতে প্রকাশ্যে মদ বিক্রির জন্য সরকারকে আবগারী করও দিতে হয় না। ওষুধ হিসাবে চালাবার জন্য কয়েক পয়সার ভিটামিন মিশিয়ে কোম্পানী প্রচুর মুনাফা লুটছে। দেশের লোকদের নেশাগ্রস্ত করার প্রচেষ্টায় এই ওষুধটি অন্যতম ভূমিকা পালন করে আসছিল। কোম্পানীটি শুঁড়িখানা না ওষুধ কোম্পানী এই প্রশ্ন স্বভাবত মনে আসে।

ভারডিভিটন এলিক্সির

সবুজ রঙ-এর মদ। আবগারী কর ফাঁকি দিয়ে ওষুধ হিসাবে চালানোর জন্য কিছু ভিটামিন মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে যা অতি পরিচিত কৌশল। ওষুধ হিসাবে অপ্রয়োজনীয় তো বটেই বরং মদ ব্যবহারে স্বাস্থ্যের বিশেষ ক্ষতি হতে পারে, বিশেষত যকৃতের (লিভার)। এই ওষুধ বিক্রয়ের মাধ্যমে কোম্পানী যেমন একদিকে প্রভূত লাভ করছে, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যহানি ঘটাচ্ছে।

অরাবোলিন ড্রপস

এই হরমোনজাতীয় ওষুধ বাচ্চাদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। শরীরের গঠন বৃদ্ধি করে বলে প্রচারিত। সাময়িকভাবে বাচ্চাদের শরীরের বৃদ্ধি ঘটালেও শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রক্রিয়াকে এই ওষুধ শেষ পর্যন্ত ব্যাহত করে। ফলে পূর্ণবয়সে যে বাচ্চা এই ওষুধ ব্যবহার করেছে তার বৃদ্ধি স্বাভাবিকের চাইতে কম থাকে। উপরন্তু হরমোন-জাতীয় পদার্থের প্রয়োগে শোথ, লিভারের টিউমার, ভিরিলাইজেশন অর্থাৎ মেয়েদের শরীরে পুরুষালি লক্ষণ ইত্যাদি অনেক ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে যেগুলোর সম্পর্কে সাবধানতা এই কোম্পানী উন্নত দেশগুলোতে দিলেও, আমাদের দেশের চিকিৎসকদের জানান না। বাচ্চাদের জন্য অতি চমৎকার ওষুধ এই বলে প্রচার চালানো হচ্ছে। এইভাবে ব্যবসার নামে জালিয়াতি করে প্রচুর মুনাফা লুটছে।

যা না হলে চলে

অনেক রোগই বিশ্বের উন্নত দেশগুলো কার্যকরীভাবে নিয়ন্ত্রণ করলেও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সে-ক্ষেত্রে চড়া মাশুল দিতে হচ্ছে। সে-সব দেশের অর্থসম্পদ সীমিত হওয়ার কারণে বাজেটে রোগ-প্রতিরোধ ও চিকিৎসা-খাতে এক নগণ্য পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ থাকে। এর ফলে শুধু রুগীর শুশ্রূষাই নয় বরং চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষাও বিঘ্নিত হয়।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অর্থনৈতিক সমস্যার সাথে জনসংখ্যা সমস্যা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সে-ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। চাহিদা ও সম্পদ অসমতা দ্রুত বেড়েছে বলে মৃত্যুহারও বেড়েছে, ফল দাঁড়িয়েছে যে প্রজনন ক্ষমতাও বেড়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাংলাদেশে মৃত্যুহার যেমন, জন্ম বৃদ্ধির হারও কোন অংশে কম নয়। জন্ম এবং মৃত্যুর হার যদি জনসংখ্যার পরিবর্তির মাধ্যমে (Demographic transition) কমিয়ে আনা না যায় তাহলে জনস্বাস্থ্যের সুযোগ-সুবিধাসহ সর্বক্ষেত্রে শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হবে।

নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত আমরা। দেশের বিভিন্ন চাহিদা পূরণের জন্য আজও আমাদের রপ্তানীর চেয়ে আমদানী বেশী করতে হয়। এ সমস্যা শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যে যেমন প্রযোজ্য, আমাদের দেশে ব্যবহৃত বিভিন্ন ওষুধের বেলায়ও একইভাবে প্রযোজ্য।

আমরা বর্তমান অথবা ভবিষ্যতের কথা না ভেবে ঐতিহ্যের মত পুরনো ধারণা আঁকড়ে ধরে আছি। উন্নত দেশের অপ্রয়োজনীয়, পরিত্যক্ত কিংবা নিষিদ্ধ সামগ্রী আমদানীতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা কোন জাতির জন্যই শোভন নয়। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে অনেক উন্নত দেশই উন্নয়নশীল দেশের এ ধরনের অজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করে থাকে এবং তাদের অবৈজ্ঞানিক বন্দি মালের বিশ্বস্ত ক্রেতা হিসেবে আমাদেরকে ব্যবহার করে থাকে। এ ধরনের ইচ্ছাকৃত অপরাধ দমনের জন্য জাতিসমূহের কমিটির মধ্যে এমন কোন নৈতিক বা আইনগত বিধি-নিষেধ দুর্ভাগ্যবশত নেই। মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য, সুখ নিয়ে যে জঘন্য পাপ-ব্যবসা চলছে তার হুবহু চিত্র তুলে ধরা সম্ভবপর নয়। চিকিৎসা পেশার সাথে জড়িত ব্যক্তি ও হতভাগ্য ক্রেতাদের জন্য কয়েকটি অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উল্লেখ না করে পারছি না।

নিকেথামাইড

বিত্তহীন অসংখ্য লোক পরম নিশ্চিন্তে নিকেথামাইড (কোরামিন) গলাধঃকরণ করে চলেছেন। অনেক সময় অবিবাহিতা (বিবাহিতাও হতে পারেন) মহিলার এ-ধরনের উক্তি শোনা মোটেও বিচিত্র নয়, 'ডাক্তারবাবু, আমার প্রায়ই মাথা ঘোরে, অস্থির

লাগে, অস্বস্তিবোধ হয় আর অসুস্থ হয়ে পড়ি। জিভে দু-তিন ফোঁটা কোরামিন দিলে সাথে-সাথে ভালো লাগে। এটা আমি দু-তিন বছর যাবত চালিয়ে যাচ্ছি ; কেননা আমার ডাক্তার বলেছেন, আমার হার্ট নাকি দুর্বল, আর এই দুর্বলতার জন্য এটা খুব উন্নতমানের টনিক।'

এবার এই উক্তির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। যদি আমরা কোন ওষুধ মুখে পুরে গিয়ে ফেলি তখন তা শরীরের ভেতরে যাবে, সঞ্চলনে পৌঁছবে, তারপর রক্ত-লেভেল অর্জন করবে। প্রতিটি ওষুধের রক্ত-লেভেল অর্জন করার একটি অনকূল মাত্রা আছে।

দু-তিন ফোঁটা কোরামিন জিভে দেয়ার সাথে-সাথে এই মহিলা ভালো বোধ করেন বলে জানিয়েছেন। প্রথমত, দু ফোঁটা কোরামিন কখনও পর্যাপ্ত মাত্রা হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, এটা পর্যাপ্ত মাত্রা হলেও সরাসরি ইন্‌জেকশনের সাহায্যে প্রয়োগ করা ছাড়া কার্যকরী হতে পারে না। সুতরাং এই বিখ্যাত হার্ট টনিকের কার্যকারিতার পেছনে বিশ্বাস ছাড়া কোথাও কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই, এর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও নেই। ভেষজবিদ্যায় এটা হলো শ্বাসীয় উত্তেজক এবং হৃৎপিণ্ডে এর কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। এছাড়া সংবহন উত্তেজক হিসেবে এর ব্যবহারেরও কোন ভিত্তি নেই।

সায়ানোকোবলামাইন (সাইটামেন, রেডিসল)

এটা হলো ভিটামিন বি^{12}। ভিটামিন বি^{12} খাবার পর শোষিত হবার জন্য একটি অপরিহার্য উপাদানের আবশ্যক। এই উপাদান পাকস্থলী তৈরী করে। এর অনুপস্থিতির কারণেই ভিটামিন বি^{12}-র অভাব হয়। এবং সেই জন্য এক বিশেষ ক্ষতিকর রক্তাল্পতা দেখা দেয়। এ কথা ঠিক যে এই ক্ষতিকর রক্তাল্পতায় আরোগ্য এনে দেয় কেবলমাত্র ভিটামিন বি^{12}, অন্যকিছু নয়। কাজেই পাকস্থলীর এই অপরিহার্য উপাদানের অভাব ঘটলে কেবল মাত্র অনান্ত্রিক (Parenteral) পথেই ভিটামিন বি^{12} গ্রহণ সঙ্গত।

কিন্তু ব্যবস্থাপত্রদানকারীরা কি সত্যি জানেন যে বাংলাদেশে এই ক্ষতিকর রক্তাল্পতার মাত্র একজন প্রকৃত রুগীর সন্ধান পাওয়া গেছে।

তাই যে-কোন ধরনের রক্তাল্পতায় রুগীর ব্যবস্থাপত্রে ভিটামিন বি^{12} দেয়ার কোন বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতা আছে কি ?

ক্যান্সারের জন্য পাকস্থলীর সম্পূর্ণ অপসারণের ফলে অপরিহার্য উপাদানের অভাবহেতু ভিটামিন বি^{12}-র ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এটা তেমন প্রয়োজনীয় নয় কারণ যকৃতে জমা হয়ে থাকা ভিটামিন বি^{12} পাঁচ-ছ বছর পর্যন্ত এর অভাব পূরণ করতে পারে। ক্যান্সারের ক্ষেত্রে পাকস্থলী অপসারণের পর শতকরা মাত্র দশজন রুগী সর্বাধিক পাঁচ বছর বেঁচে থাকে।

ভিটামিন বি^{12}-র দৈনিক চাহিদা হচ্ছে ২-৩ মাইক্রোগ্রাম। পশুর যকৃত, বৃক্ক, গোশ্‌ত, দুধ, পনীর, মাছ ও ডিমের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বি^{12} পাওয়া যায়। প্রাত্যহিক চাহিদা এত অল্প যে, কদাচিৎ ভিটামিন বি^{12} স্বল্পতা দেখা যায়।

প্রান্তিক স্নায়ুরোগ (Pripheral neuropathy)-এর জন্যে ভিটামিন বি^{12} দেয়া হয়। এটি সম্পূর্ণ পরীক্ষামূলক এর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

তথাকথিত টনিকে ভিটামিন বি^{12}-অন্তর্ভুক্তির জন্য দাম দিতে হয় বেশী অথচ উপকার নেই।

ফিতা কৃমির দরুন ভিটামিন বি ^{12}-র ঘাটতি পৃথিবীর এই অংশে দেখা যায়নি। আমাদের দেশে মেগালো ব্লাষ্টিক নামের রক্তাল্পতার প্রধান কারণ গর্ভধারণ ও অশোষণ (Malabsorption)। এসব ক্ষেত্রে ফোলিক এ্যাসিড স্বল্পতাই মূল কারণ। যেখানে পরীক্ষাগার নেই সেখানে রক্তাল্পতার জন্য লৌহ ও ফোলিক এ্যাসিড-এর ব্যবস্থাপত্র দেয়ার যথেষ্ট যৌক্তিকতা রয়েছে। মুখ দিয়ে কিংবা ত্বক, পেশী বা শিরার মধ্যে উচ্চ অথবা কম মাত্রায় ভিটামিন বি ^{12} অনুপ্রবেশ করানোর ব্যবস্থাপত্র সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় এবং অবৈজ্ঞানিক। এই ভিটামিনের প্রতি আমাদের বিশ্বাস এত গভীর যে এর সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সাধারণ লোকদের, সাংবাদিকদের এবং কিছু-কিছু ডাক্তারদের বুঝাতে সময় লাগবে। এটা কি খুবই হাসির ব্যাপার নয় যে, কখনও-কখনও ভিটামিন বি ^{12}-কে ব্যবস্থাপত্রে ক্ষুধা বৃদ্ধিকারক হিসেবে উল্লেখ করা হয় ?

ভিটামিন সি

পূর্ণবয়স্ক একজন ব্যক্তির জন্য ভিটামিন সি-এর প্রাত্যহিক চাহিদা গড়ে ৪৫ মিলিগ্রাম এবং গর্ভবতী ও স্তনাদানকারী মহিলার ৬০ মিলিগ্রাম। টকজাতীয় ফল যেমন : লেবু, কমলা, টমাটো, কামরাঙ্গা আমলকী এবং সবুজ শাকসব্জীতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি বর্তমান। এর অভাবে স্কার্ভি রোগ হয়। এ রোগের প্রাথমিক লক্ষণ হলো দাঁতের মাড়ি ফোলা ও রক্তক্ষরণ, কেরাটোটিকা-আধিক্য(Hyperkeratotic) কেশ গ্রন্থী। পরবর্তী লক্ষণসমূহ হলো মাংসপেশীর প্রচন্ড মোচড়, শরীরের বিভিন্ন জোড়া ফুলে যাওয়া, রক্তক্ষরণপ্রবণতা, রক্তাপ্লতা, দাঁত নড়া বা পড়ে যাওয়া।

মারাত্মক সংক্রমণ, ক্ষত, হাড়ভাঙ্গা এবং পোড়া ক্ষত নিরাময় এবং বিশেষ করে স্কার্ভি রোগের জন্য এই ভিটামিন খুবই কার্যকরী। বর্তমানে যে মাত্রায় এটা ব্যবহার করা হচ্ছে তা খুবই বেশী। সাধারণত প্রাত্যাহিক ১০০ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি-সহ নিত্য দিনের খাবার খেলে দ্রুত আরোগ্য লাভ হয়। কারণ শরীরে ঘাটতি অবস্থায় ওষুধের কার্যক্ষমতা বেড়ে যায়।

সাধারণ সর্দির চিকিৎসায় ভিটামিন সি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে যদিও এই রোগ-এর কার্যকারিতা কখনও প্রমাণিত হয়নি। এ ছাড়া দীর্ঘদিন ভিটামিন সি গ্রহণের ফলে মূত্রাশয়ে যে পাথর হতে পারে সে খবর এখন পর্যন্ত অনেক চিকিৎসকেরই জানা নেই।

মেগাভিটামিন চিকিৎসা

বিশুদ্ধ অথবা কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রস্তুত ভিটামিনের চেয়ে নানান ভিটামিনের

'অশোধিত' উৎসগুলো চিকিৎসার ক্ষেত্রে মাঝে-মাঝে বেশী কার্যকর হয়ে থাকে। বিশেষ ভিটামিনের অভাবে সৃষ্ট গুরুতর অবস্থায় 'বিশুদ্ধ' ভিটামিন দেয়া প্রয়োজন। বহুবিধ ভিটামিন স্বল্পতার জন্য বিশুদ্ধ ভিটামিন ব্যবহার অবস্থার উন্নতি না করে অবনতি ঘটাবে।

ভিটামিন-স্বল্পতার চিকিৎসা হচ্ছে পর্যাপ্ত সুষম, আমিষ ও ভিটামিন গ্রহণ। সাধারণভাবে যে পরিমাণ ভিটামিনের প্রাত্যহিক প্রয়োজন চিকিৎসার ক্ষেত্রে সে পরিমাণের পাঁচ দশগুণ বেশী গ্রহণ করতে হয়।

ব্যবস্থাপত্রে দেয়া বিশুদ্ধ ভিটামিন অনেক ক্ষেত্রে অশোধিত ভিটামিনের চেয়ে কম কার্যকর হয়। বিশুদ্ধকরণে কিছু প্রয়োজনীয় উপাদান সরিয়ে ফেলা কিংবা গুণাগুণ নষ্ট হওয়া অমূলক নয়। সুতরাং যুক্তিসঙ্গতভাবেই আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভর করতে হবে।

কতকগুলো ভিটামিন যেমন এ, ডি, কে এবং নিয়াসিন-এর অধিক মাত্রা বিষাক্ত (Toxic) এবং দীর্ঘদিন ধরে এগুলো গ্রহণ করা হলে অসুস্থ হবার আশঙ্কা থাকে। শুধুমাত্র এই একটি কারণেই অনির্ণীত ব্যাধির জন্য তথাকথিত জনপ্রিয় মেগাভিটামিন চিকিৎসা কোনক্রমেই যুক্তিযুক্ত নয় বরং বিপজ্জনকও বটে।

ভিটামিন চিকিৎসার বিপদ

ভিটামিন 'এ' যদি ছয়মাস বা তারও বেশী সময় ধরে ৭৫০০ একক খাওয়া হয় তবে বিশেষ করে শিশুদের ভিটামিন 'এ' আধিক্য (Hypervitaminosis) হয়। অরুচি ও ওজনহ্রাস, যকৃত বৃদ্ধি. রক্তে ক্যালশিয়াম-আধিক্য. প্লীহা বৃদ্ধি, রক্তাল্পতা এবং নানাবিধ স্নায়বিক গোলযোগ দেখা দেয়।

প্রতিদিন কম করে ৫০০ একক ভিটামিন ডি দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে ভিটামিন ডি আধিক্য হয়। এ থেকে বৃক্কের ক্ষতি এবং ক্যালসিয়াম সঞ্চয়ন স্থানান্তকরণ (Metastatic Calcification) রোগ হয়।

জলে দ্রবণীয় ভিটামিন কে (কে৩ মেনাডিওন থেকে আহরিত) ছোট শিশু বিশেষ করে নবজাতকদের বেশী মাত্রায় দিলে হেমোলিটিক রক্তাল্পতা হয়, পিত্ত-রঞ্জনাধিক্য ঘটে (Hyperbilirubinaemia) ও যকৃত বৃদ্ধি হয়। বড়দের G-6 PD স্বল্পতাজনিত কারণে এই ভিটামিন হেমোলিটিক প্রতিক্রিয়া করতে পারে।

শুধুমাত্র পথ্যের অভাবজনিত কারণে ভিটামিন কে স্বল্পতা হয় না বললেই চলে। এণ্টিবায়োটিক কিংবা অশোষণীয় সালফোনামাইড দিয়ে দীর্ঘদিন চিকিৎসা করলে যা ভিটামিন কে-র অনুজীব সংশ্লেষণকে (Micro-organism synthesis) বাধা দেয়, সেখানে ভিটামিন কে স্বল্পতা দেখা দিতে পারে।

দীর্ঘদিন অধিক মাত্রায় ভিটামিন সি গ্রহণের দরুন বিপদের কথা আগেই বলা হয়েছে।

গ্লিসারোফসফেট এবং লেসিথিন

খুবই জনপ্রিয় স্নায়ু টনিক (যেমন বিজিফস, নিউরোপ্লেক্স নিরোলোসিথিন, নিউরনস ইত্যাদি) নাকি খুব কাজের এবং বিভিন্ন গ্লিসারোফসফেট এবং লেসিথিন জীবনীশক্তি, স্মৃতিশক্তি, এমন কি, বুদ্ধিমত্তার জন্য উপকারী ওষুধ বলে দাবী করা হয়। বিভিন্ন ধরনের চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন অধিকাংশ রুগীকেই বিপথে নিতে পারে, যতনা নিচ্ছে জ্ঞানহীন চিকিৎসক। এসব টনিকের দাম অনেক বেশী। যেমন দশ থেকে কুড়ি আউন্স পরিমাণ ওষুধের দাম সতেরো টাকা থেকে শুরু করে ষাট টাকা পর্যন্ত। সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, এসব ওষুধ সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়।

লিউইস ফার্মাকোলজি (১৯৭০) থেকে উদ্ধৃত করা যায়: তথাকথিত টনিকের (শরীরবৃত্তে যার কোন বলকারক ক্ষমতা নেই) সাধারণ লোক ও গৃহচিকিৎসকদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা, সেই সব টনিকের তিক্ত সুরাবিশেষের ওপর নির্ভর করে। তাদের অন্যান্য উপাদান যেমন গ্লিসারোফসফেট, লৌহ, ভিটামিন এবং যকৃত-নির্যাস প্রভৃতি কোনরূপ সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই জুড়ে দেয়া হয়। তথাকথিত 'নিউরো-ফসফেট' কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কোন উপকারে আসে না।

রেচক (লাক্সাটিভ)

রক্তক্ষরণের মত বিরেচন (Purgation) এককালে জনপ্রিয় ও মারাত্মক চিকিৎসা পদ্ধতি ছিল। সাময়িক বিশেষ অবস্থায় যেমন: আফিম-ঘটিত ওষুধ সেবনের আগে কোষ্ঠকাঠিন্য উপশমের জন্য কিংবা অপারেশনের পর বা অর্শ রুগীর রক্তক্ষরণের সময় মল নরম রাখার জন্য বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বর্তমানে রেচক দিয়ে থাকেন।

অনেকে মনে করেন স্বাভাবিক মলত্যাগের অভ্যাস অবশ্যই বজায় রাখতে হবে। অনেকে আবার স্ববিষক্রিয়ার (Autointoxication) ধারণায় ভোগেন বলে স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য এক নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে মলত্যাগ করেন। মলত্যাগ করাটা সর্বাগ্রে করণীয় কর্ম বলে অনেকে এক ধরনের বিকারে ভোগেন, যদিও সংখ্যার ব্যাপারে তারা মোটেই মাথা ঘামান না।

রেচকের ব্যবহার অভ্যাসে পরিণত হতে পারে। মলান্ত্রে মল আবার ভরে না ওঠা পর্যন্ত রেচকের সাহায্যে মলত্যাগের পর থেকে পরবর্তী বেগ না আসার মধ্যে বিরতি থাকতে হবে। যদি কারুর কাছে এই বিরতি খুব দীর্ঘ মনে হয়, তবে অউদ্দীপিত বেগ আসার জন্য অপেক্ষা না করে রেচক পুনরায় গ্রহণ করতে পারে। অনির্দিষ্টভাবে এই আবর্তনের পুনরাবৃত্তি হতে পারে।

কোন কোন চিকিৎসক প্রায়ই ভুলে যান যে, রেচক আয়ন-এক্সচেঞ্জ রেজিন নয় যা অপ্রয়োজনীয় মল নিঃসরণ করিয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু শোষণে সহায়তা করে। এটা ইলেকট্রোলাইট বিমুক্ত করে, স্বাভাবিক মলত্যাগ সাংঘাতিকভাবে ব্যাহত করে এবং কঠিন কোষ্ঠ-কাঠিন্য সৃষ্টি করে। দুর্ভাগ্যবশত অনেকে বোঝেন না যে, প্রকৃতি শরীর থেকে অপ্রয়োজনীয় বস্তু নিঃসরণের সুন্দর ব্যবস্থা করে রেখেছে, যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস,

শ্বাস-প্রশ্বাস, মলত্যাগ ইত্যাদি। উত্তেজক রাসায়নিক পরিবর্তনের কারণে কোষ্ঠকাঠিন্য হয় না, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মানসিক কারণেই হয়। মানবিক বুদ্ধিমত্তার একটা প্রভাব তার মলত্যাগের অভ্যাসের, বিশেষ করে কোষ্ঠকাঠিন্যর ওপর আছে। কিন্তু ইতর প্রাণীবিশেষের তা নেই। একথা পরিষ্কার মনে রাখা দরকার যে, প্রতিদিন মলত্যাগ সর্বজনীন নয়। এটাও অজানা নয় যে, বহু লোক সপ্তাহে, দু-সপ্তাহে, এমন কি. তারও বেশী সময় পরে মলত্যাগ করে থাকে।

আমিষাম্ল (Amino acid) এবং এনজাইম

যে-সব রোগে এই দুটি গ্রুপে প্রস্তুত ওষুধ ব্যবহৃত হয় বলে দেখা যায়, বদহজম তার শীর্ষে।

বিষাক্ত দ্রব্যগুলোর বিষক্রিয়া নষ্ট করা যকৃতের অন্যতম কাজ। যকৃতের পীড়ায় এবং বিশেষ করে যকৃত বিশুষ্কতা (Cirrhosis)-র বেলায় নানাবিধ বিষাক্ত দ্রব্য যকৃতের কার্যকরী রাসায়নিক পরিবর্তন ছাড়াই মস্তিষ্কে পেঁাছে যেতে পারে। যদিও মস্তিষ্ক বিষের (Cerebral intoxicants) প্রকৃতি বিতর্কিত. তবুও এ্যামোনিয়ার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত। বিভিন্ন ধরনের যকৃত পীড়ায় বিশেষ করে ভাইরাসজাত যকৃত প্রদাহ এবং যকৃত বিশুষ্কতায় এ্যামিনো এসিডের কোন ভূমিকা নেই। এগুলো রক্তে এমোনিয়াম লেভেল কমায় বলে বলা হলেও এর ফলাফল ধারাবাহিকভাবে ব্যবহার করার পক্ষে রায় দেয় না। হেপাটোসেলুলার অবনতিতে এ্যামিনো এসিড (যেমন মেথিওনাইন) রুগীর কাছে বিষবৎ। যকৃতে এগুলোর রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে না এবং প্রস্রাবের সাথে বেরিয়ে যায়। একই রকম লিপোট্রোপস (যেমন কোলিন) মূল্যহীন এবং বিষাক্ত হতে পারে।

ক্যালসিয়াম

ক্যালসিয়াম বল ও জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করে বলে লোকের বিশ্বাস এত গভীর যে রুগীরাই চিকিৎসককে ব্যবস্থাপত্রে ক্যালসিয়াম ইনজেকশন লিখে দিতে অনুরোধ করেন।

এ-কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, রক্তের মধ্যে (serum) ক্যালসিয়াম লেভেল বৃদ্ধি হৃদপিণ্ডের মাংশপেশীর সংকোচন বাড়িয়ে দেয় এবং নিলয়ী অসম স্পন্দন (Ventricular extras stole) ঘটাতে পারে। বিশেষ করে যখন রুগী ডিজিটালিস নামের ওষুধ সেবন অবস্থায় থাকে তখন এগুলো বেড়ে যেতে পারে। এছাড়া অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি গ্রহণের বিষক্রিয়ার ফলে অরুচি, দুর্বলতা, কোষ্ঠকাঠিন্য ও বমির উদ্রেক করতে পারে। রক্তক্ষরণজনিত বৈকল্যে ওষুধ হিসেবে ক্যালসিয়াম পুরোপুরি অপ্রয়োজনীয়। দুর্ভাগ্যবশত রক্তরোধক হিসেবে এটা খুব বেশী ব্যবহার করা হয়।

এ প্রসঙ্গে বাজারে প্রচলিত বিভিন্ন ব্যবসায়িক নামের রক্তরোধক সম্পর্কে দুটি কথা বলা প্রয়োজন। কোন নির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই অনেক সময় রক্তক্ষরণ ঘটে। কতকক্ষেত্রে

সংবহন নালিকা-সংক্রান্ত (Vascular) অস্বাভাবিকতা দায়ী, অপরাপর ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কারণ পাওয়া যায় না।

কিন্তু যে-ভাবে এই সব রক্তরোধক ব্যবহৃত হচ্ছে তার পেছনে বৈজ্ঞানিক কোন যুক্তি নেই। রক্তক্ষরণ বিশেষ করে রক্তবমি হলে দৃঢ় আশ্বাস এবং শয্যায় থেকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন। পাকান্ত্রিক নালী (Gastrointestinal tract) থেকে রক্তক্ষরণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ঘা, ক্যান্সার বা স্ফীত ও প্রলম্বিত ধমনী (Varices)-র জন্য হয়। সুতরাং এটা সহজেই অনুমেয় যে, তথাকথিত রক্তরোধক কতটা উপকারী।

এমনি ভাবে বহু ওষুধের অপব্যবহার হচ্ছে। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে যেখানে বেশীর ভাগ লোক প্রয়োজনীয় ওষুধ কিনতে অক্ষম সেখানে মূল্যবান অথচ অপ্রয়োজনীয় এমনকি কতক ক্ষেত্রে ক্ষতিকর ওষুধের ব্যবস্থাপত্র দেয়া রীতিমত পাপ। বৈজ্ঞানিক ন্যাযাতা ছাড়াও সীমিত বৈদেশিক মুদ্রার কারণে ওষুধ অবশ্যই আমাদের দেশে প্রস্তুত করতে হবে এবং সেই সঙ্গে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত, উপকারী, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ওষুধ বিদেশ থেকে আমদানী করতে হবে। ২৮তম বিশ্বস্বাস্থ্য অধিবেশনে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান পরিচালক তাঁর প্রতিবেদনে বলেন: উন্নত দেশগুলোর বর্তমান সমস্যা হলো বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অধিক মাত্রায় ওষুধ ব্যবহার অথবা অপ-ব্যবহারের ফলে ওষুধে অত্যধিক ব্যয়। প্রস্তুতকারীর নিজ দেশে যে সব ওষুধ বিক্রির অনুমতি দেয়া হয় না কিংবা নিরাপত্তা অথবা কার্যকারিতার অভাবে বাজার থেকে তুলে নেয়া হয়, সে-সব ওষুধ উন্নয়নশীল দেশে রপ্তানী করে ওষুধের গুণাগুণ সম্পর্কে জোর প্রচার চালান হয়। এই রীতি শুধু বে-আইনীই নয়, নীতিবহির্গত এবং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

একথা স্পষ্টত প্রতীয়মান যে, একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উন্নত দেশে প্রস্তুত ও রপ্তানী করা বহু পরিত্যক্ত এমন কি বিপজ্জনক ওষুধ আমরা ব্যবহার করে আসছি। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য দায়ী প্রতিটি ব্যক্তির নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে কোন ব্যক্তির নিজ আর্থিক সামর্থের পূর্ণ সদব্যবহারের সুযোগ দেয়া। আজকাল ব্যবস্থাপত্রে এমনও অনেকে ওষুধের নাম থাকে যেগুলো পরিত্যাগ করার মত। এগুলো পরিত্যাগ করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। কাজেই আমাদের সই করা প্রতিটি ব্যবস্থাপত্র অবশ্যই সঙ্গত হতে হবে।

নিষিদ্ধ ওষুধ
—কি ও কেন

অন্যান্য অনেক উন্নয়নশীল দেশের মত বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই (শতকরা ৮০ ভাগ) প্রয়োজনের সময় ওষুধ পায় না। অথচ বাংলাদেশ সাম্প্রতিককালে বৎসরে প্রায় ৬০ কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার ওষুধ আমদানী করেছে। এই অর্থ ১৯৭৯-৮০ সালের বাজেটে মোট স্বাস্থ্য খাতের ১·৭ গুণ। এত অর্থ ব্যয় করেও ব্যাপক জনসাধারণের নাগালের মধ্যে জীবনরক্ষাকারী বা প্রয়োজনীয় ওষুধ পেঁছে দিতে আমাদের ব্যর্থতার কারণ কি?

যে-সব ওষুধ আমাদের দেশের বাজারে চালু আছে, এদেশে ব্যবসারত বিভিন্ন বিদেশী প্রতিষ্ঠানের জরীপ থেকেই দেখা যায় তার অধিকাংশই অপ্রয়োজনীয় অথবা ক্ষতিকর। একটি জরীপ থেকে জানা যায় যে মোট উৎপাদনের শতকরা ৩৩ ভাগই হচ্ছে ভিটামিন, আয়রন টনিক, কাশি ও ঠাণ্ডার ওষুধ। তথাকথিত টনিক, বলবর্ধক ও মোটা হবার ওষুধ, এনজাইম বা হজমীকারক, এন্টাসিড ও মানসিক রোগের ওষুধ। অথচ এ্যান্টিবায়োটিক, কৃমি ও পরজীবী-বিধ্বংসী ওষুধ ইত্যাদির উৎপাদন মাত্র শতকরা ২৩ ভাগ। যদিও এগুলো এদেশের মানুষের জন্য আরও বেশী প্রয়োজন। সীমিত সম্পদের অধিকারী আমাদের দেশের পক্ষে অপচয় মারাত্মক। প্রয়োজনীয় ও জীবনরক্ষাকারী ওষুধের জন্য সমপরিমাণ অর্থ ব্যয় আরও অনেক মানুষের কল্যাণ নিয়ে আসবে।

চিকিৎসা ব্যবস্থা ও চিকিৎসকের অপ্রতুলতার দরুন জনসমষ্টিকে বর্তমানে আমাদের দেশে উপযুক্ত স্বাস্থ্য-পরিচর্যা দেওয়া সম্ভব নয় এবং অদূর ভবিষ্যতেও সম্ভব হবে না। কাজেই বেশীর ভাগ লোককেই, বিশেষত গ্রাম এলাকায়, অসুখের সময় গ্রাম্য হাতুড়ে চিকিৎসকদের পরামর্শমত ওষুধ ব্যবহার করতে হয়। অনেকেই নিজেদের পছন্দমত ওষুধ কেনেন। ওষুধের কার্যকারিতা সম্বন্ধে কোম্পানীগুলোর অযৌক্তিক দাবী ও বিভ্রান্তিকর প্রচারণার ফলে অপ্রয়োজনীয় ওষুধের পিছনেই দরিদ্র জনসাধারণ প্রভূত অর্থ ব্যয় করে থাকেন। চিকিৎসকরাও অনেক সময় প্রয়োজনীয় ওষুধের সাথে-সাথে অপ্রয়োজনীয় অথবা তেমন প্রয়োজন নয় এমন ওষুধ লেখেন। দেখা গেছে যে সীমিত অর্থের কারণে রুগী অপ্রয়োজনীয় বা কম প্রয়োজনীয় ওষুধই কিনছে, জরুরী বা জীবনরক্ষাকারী ওষুধ কিনছে না—কারণ কোনটা বেশী প্রয়োজনীয় আর কোনটা কম

প্রয়োজনীয়, তা রুগী বা তার আত্মীয়-স্বজনের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। এই ধরনের অপ্রয়োজনীয় ওষুধ আমাদের দেশ ছাড়াও অন্যান্য কোন-কোন দেশে চালু আছে। কিন্তু সে-সব দেশের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য রয়েছে। সে সমস্ত দেশে ব্যক্তিগত আর্থিক স্বচ্ছলতা রয়েছে। ওষুধ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের জ্ঞানও বেশী এবং প্রায় ওষুধই ডাক্তারের নির্দেশ ছাড়া দেওয়া হয় না। আমাদের দেশে অপ্রয়োজনীয় ওষুধের জন্য অর্থ অপচয় প্রতিরোধের একমাত্র পথ হচ্ছে জনগণের নাগালের মধ্য থেকে এগুলোকে সরিয়ে নেওয়া।

বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশসমূহের ওষুধ সম্পর্কিত উপরোল্লিখিত পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ মহলে সুবিদিত। পরিস্থিতির যথোপযুক্ত পর্যালোচনার পর বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞ পরিষদ ১৯৭৯ সালে সুপারিশ করেন যে, ব্যাপক জনগণের কাছে প্রয়োজনীয় ও জীবনরক্ষাকারী ওষুধ পৌঁছানোর পথ হচ্ছে প্রত্যেক দেশে স্থানীয় প্রয়োজন অনুযায়ী একটি প্রয়োজনীয় ওষুধের তালিকা প্রস্তুত করা এবং ওষুধের সরবরাহ এই তালিকা অনুযায়ী সীমাবদ্ধ রাখা। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞ পরিষদ একটি খসড়া তালিকাও প্রণয়ন করেন। উল্লেখ করা যায় বাংলাদেশে বাজারজাত অধিকাংশ ওষুধই এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত নয়। অপ্রয়োজনীয় ওষুধের ব্যবহার বন্ধ করার বাংলাদেশী প্রয়াস বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞদের সিদ্ধান্ত ও সুপারিশের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এ ছাড়া বহু ওষুধ রয়েছে যেগুলোর কার্যকারিতার চেয়ে বিষক্রিয়া অনেক বেশী। এই কারণে উন্নত দেশসমূহে এই ওষুধগুলোর ব্যবহার ও বাজারজাতকরণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকার দরুন এই ধরনের অনেক ওষুধই আমাদের দেশে চালু রয়েছে। এর মধ্যে কিছু ওষুধ রয়েছে যা অপ্রয়োজনীয় বা কার্যকারিতাহীন। এগুলো বাজারে রাখার কোন যৌক্তিকতা নেই। কোন-কোন ওষুধ কার্যকর—কিন্তু বিষক্রিয়াহীন বিকল্প ওষুধও রয়েছে। অতএব মারাত্মক বিষক্রিয়ার সম্ভাবনাবহুল এই ওষুধগুলো জনগণের নাগালের বাইরে নেওয়া উচিত।

ওষুধ বাজারে চালু রাখা বা বাতিল করার সিদ্ধান্ত সরকার কর্তৃক গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি কতকগুলো নীতির ওপর ভিত্তি করে গ্রহণ করেন। নীতিমালার গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো নিচে উল্লেখ করা হল :

ক. সাধারণভাবে একের অধিক উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তুত ওষুধ বাজারে চালু রাখা হবে না (কতকগুলো ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রয়েছে)। কেননা এর ফলে যে বিশেষ উপাদান রুগীর জন্য প্রয়োজন নেই, তাকেও সে উপাদান কিনতে এবং ব্যবহার করতে বাধ্য করা হচ্ছে। এ ছাড়া প্রয়োজনে রুগীর জন্য একটি একটি উপাদানের ভিন্ন মাত্রাও চিকিৎসকগণ ব্যবহার করতে পারেন না। কারণ মিশ্রিত ওষুধে উপাদানের পরিমাণ স্থির থাকে। উপাদানসমূহ আলাদা-আলাদা ওষুধ হিসাবে চালু থাকতে পারে, যদি সেগুলো প্রয়োজনীয় হয়। বিশেষত এ্যান্টিবায়োটিকের সংমিশ্রণ ও এ্যান্টিবায়োটিকের সাথে কর্টিকোস্টেরয়েড বা ভিটামিনের সংমিশ্রণ রাখা যাবে না। ব্যথা-উপশমকারী

ওষুধসমূহের সংমিশ্রণও বন্ধ করা হবে, কারণ এতে কার্যকারিতা বৃদ্ধি হয় না অথচ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

খ. বি-কমপ্লেস ভিটামিনসমূহের কার্যকারিতা যেহেতু পরস্পরসম্পর্কিত, অতএব সংমিশ্রণ হিসাবে এগুলো চালু থাকবে। কিন্তু অন্যান্য ভিটামিন পৃথক-পৃথক ওষুধ হিসাবে চালু করতে হবে। তরল ভিটামিন ওষুধ তৈরী করা যাবে না, কারণ এতে জাতীয় সম্পদের সর্বাধিক অপচয় ঘটে। শুধু শিশুদের জন্য ড্রপ আকারে ভিটামিন বাজারজাত করা যাবে।

গ. কফ্ মিকশ্চার, থ্রোট লজেন্স, গ্রাইপ ওয়াটার, এ্যালকালি, ইত্যাদির রোগ ভাল করার ক্ষমতা নেই বললেই চলে। এই জাতীয় ওষুধের উৎপাদন এবং আমদানী বন্ধ করা প্রয়োজন যাতে আমাদের সীমিত সম্পদের অপচয় না হয়।

ঘ. টনিক ও বলবৃদ্ধিকারী ওষুধসমূহের কোন কার্যকারিতা নেই, অথচ প্রচুর মানুষ বিভ্রান্তি ও অজ্ঞতার কারণে এগুলোর জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করেন। উপরন্তু মাদকদ্রব্য থাকার জন্য এগুলো একটা অভ্যাস, এমন কি, নির্ভরতার সৃষ্টি করতে পারে। এগুলোর উৎপাদন এবং আমদানী বন্ধ করা হবে।

ঙ. এনজাইম এবং হজমের ওষুধও প্রভূত অর্থের অপচয় ঘটায়। যদিও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এগুলোর কোন কার্যকারিতা নেই। শুধুমাত্র প্যানক্রিয়াস গ্লাণ্ডের এনজাইমসমূহ ও ল্যাকটেজ একক উপাদান হিসাবে বাজারজাত করা যাবে, কারণ কোন-কোন বিশেষ ক্ষেত্রে এগুলোর ব্যবহার প্রয়োজন।

চ. শিশুদের জন্য ক্ষতিকর কোন এ্যাণ্টিবায়োটিক তরল আকারে বাজারজাত করা যাবে না।

ছ. ক্ষতিকর, অপ্রয়োজনীয় ও সন্দেহজনক কার্যকারিতার অপব্যবহৃত ওষুধ নিষিদ্ধ করা হবে। বৃটিশ ফার্মাকোপিয়া বা বৃটিশ ফার্মাসিউটিক্যাল কোডেক্স-এ সম্প্রতি অন্তর্ভুক্ত নয়, এসব ওষুধও চালু রাখা যাবে না।

জ. প্রমাণিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াসম্পন্ন কতকগুলো ওষুধ চালু রাখা হবে শুধু বিশেষজ্ঞদের ব্যবহারের জন্য। কারণ বিশেষ রোগে এগুলোর ভূমিকা রয়েছে।

ঝ. স্থানীয়ভাবে যদি কোন ওষুধ বা উপাদান বা এগুলোর বিকল্প যথেষ্ট উৎপাদিত হয়, তবে বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণের জন্য এগুলো আমদানী করা যাবে না। বাংলাদেশে নিজস্ব কারখানা না থাকলে বিদেশী কোম্পানীগুলোকে অন্যের কারখানায় তৈরী করে ওষুধ বাজারজাত করতে দেওয়া উচিত নয়। যে-সব ওষুধ প্রস্তুত করা সহজ (যেমন ভিটামিন ও এ্যান্টাসিড) সেগুলো শুধু দেশী কোম্পানীগুলোই প্রস্তুত করবে। জটিলতর প্রস্তুতপ্রণালীসম্পন্ন ওষুধ প্রস্তুতে বহুজাতিক সংস্থাগুলোর আত্ম-নিয়োগ করা উচিত।

বাতিলকৃত ওষুধগুলোকে তিনটি তালিকায় বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম তালিকার রয়েছে সেই সমস্ত ওষুধ যেগুলোর কার্যকারিতার চেয়ে ক্ষতিকর প্রভাব বেশী এবং

যেগুলোর যথোপযুক্ত বিকল্প রয়েছে। এর মধ্যে অনেক ওষুধ রয়েছে যেগুলো উন্নত দেশসমূহে নিষিদ্ধ করা হয়েছে অথবা বাজারজাত করার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

প্রথম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কিছু ওষুধের নাম ও বাতিলের প্রধান কারণ উল্লেখ করা হল:

বাণিজ্যিক নাম	বাতিলের কারণ
১. টেট্রাসাইক্লিন সিরাপ ; যেমন: ক্লিনমাইসিন, ভাইব্রামাইসিন, টেবা-মাইসিন, ইমপেরাসিন, সুমাইসিন, রেস্টেক্লিন, এ্যালডাসাইক্লিন, অক্সালিন, লেডারমাইসিন ইত্যাদি সিরাপসমূহ।	টেট্রাসাইক্লিন সিরাপসমূহ শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের জন্য ক্ষতিকর। কারণ এটা শিশুদের হাড়ের বৃদ্ধি কমিয়ে দেয় ও দাঁতের রঙ পরিবর্তন করে।
২. হাইড্রোক্সিকুইনোলিন-জাতীয় ওষুধ ; যেমন: এনটারোভায়োফর্ম, মেক্সাফর্ম, স্টেরিকিল, রেসোট্রেন, ডায়াডোকুইন, ডিপেনডাল, ইনটে-সটোপান, এ্যাডাইসিন, আয়াডো-কুইন, এনটারোগুয়ানিডিন, কুইক্সালিন, নিভেমবিন, ফাইস্ট্রেপ, ডাইসেডিন ইত্যাদি।	এই জাতীয় ওষুধ স্নায়ুতন্ত্রের এক ধরনের ব্যাধি (সাবএকিউট মাইলো-অপটিক নিউরোপ্যাথী) সৃষ্টি করতে পারে। এই অসুখে হাত-পায়ের অবশ হওয়া ও অন্ধত্ব হতে পারে। অথচ এইসব ওষুধের কার্যকর অথচ কম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াসম্পন্ন বিকল্প রয়েছে। এই ধরনের কয়েকটি ওষুধে একাধিক উপাদানের সংমিশ্রণও রয়েছে যা নীতি-মালা বিরোধী।
৩. মাদকদ্রব্য (এ্যালকোহল)-সমন্বিত ও ভিটামিন-মিনারেলযুক্ত টনিক ; যেমন: পলিটামিন, ভারডিভিটন এলিক্সির, টোনাম, ডুরল, রুব্রাটন এলিক্সির, সেড জেনারেল টনিক, নিউরোপ্লেক্স, নিউরোলেসিথিন, নিউরোনা, ভিটাটোন, এডিকোমল্ট এক্সট্রাক্ট, কালমেঘ, অশোকা করডিয়েল, ফেরোটোন, ফেরিটোন ইত্যাদি।	একাধিক ভিটামিন ও কোন কোন ক্ষেত্রে মিনারেলের সমন্বয় নীতিমালা বিরোধী। এছাড়া মাদ্রকদ্রব্যের সংযোজন অভ্যাস, এমন কি, নির্ভরতার সৃষ্টি করতে পারে ও যকৃতের জন্য ক্ষতিকর। নাম টনিক হলেও কোন টনিক-ক্ষমতা নেই, সাময়িক উত্তেজনা আনে মাত্র। এ্যালকোহলের পরিমাণ কোন-কোন ক্ষেত্রে বিয়ার, ওয়াইন ইত্যাদি মদগুলোর চেয়েও বেশী।

বাণিজ্যিক নাম	বাতিলের কারণ
৪. মাদকদ্রব্য, ভিটামিন ও এনজাইম সমন্বিত ওষুধ-সমূহ ; যেমন : ডাইজাইম, ডায়াপ্টোজাইম, ডেকা-জাইম, পেপটেনজাইম, জাকোজাইম ইত্যাদি।	মাদকদ্রব্যের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, একাধিক ভিটামিনের সংমিশ্রণ ও এনজাইমের কার্যকারিতার অভাব।
৫. ক্ষুধা বা রুচিবর্ধক ওষুধ-সমূহ ; যেমন : পেরিয়াকটিন, পেরিয়া-কটিন ভিটা, পেরিটল, পেরিডিন, পেরিগান, হেপটামিন সিপটাডিন ইত্যাদি।	এই ওষুধসমূহের উপাদান সাইপ্রো-হেপ্টাডিন-এর অনেক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে, যেমন : রক্তকণিকা কমে যাওয়া, রক্তপাত হওয়া, দৃষ্টিশক্তির গণ্ডগোল, মানসিক ব্যাধি, ইত্যাদি। এই ওষুধ সাময়িক রুচি বৃদ্ধি করলেও শেষ পর্যন্ত কার্যকর থাকে না, রুচি কমে যাওয়ার মূল কারণ দূর করে না।
৬. মাদকদ্রব্যসমন্বিত কফ্ সিরাপ ; যেমন : সিরাপ বাসক, বেক্সোলীন, কেফেব্লক্সে, এ্যাস-মালেক্স, প্রোমোডিল ইত্যাদি।	অভ্যাস সৃষ্টিকারী কোডিন রয়েছে। কফের মূল কারণ দূর না করে শুধু লক্ষণ কমায়। রোগ নিরাময় করে বলে প্রমাণিত হয়নি।
৭. একাধিক উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তুত অথবা ক্ষতিকর বেদনা-নাশক ওষুধ ; যেমন : নোভালজিন ট্যাবলেট, ইনজেকশন এবং ড্রপস ; বেরালজিন ট্যাবলেট, বাসকোলাই-সিন ইনজেকসন ইত্যাদি।	প্রমাণিত ক্ষতিকর উপাদানে প্রস্তুত এবং অনেক দেশে নিষিদ্ধ। একাধিক উপাদানের সংমিশ্রণ নীতিমালা বিরোধী।
৮. গ্রাইপ ওয়াটার	শিশুদের পেট ব্যথা বা কান্নার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শিশুদের এই জাতীয় লক্ষণ সাধারণত ক্ষতিকর নয় ও আপনিই ভাল হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রেই শিশু ক্ষুধা, কাপড় ভিজা থাকা অথবা মা-বাবার আদর পাবার জন্য কাঁদে। গ্রাইপ ওয়াটার এসব ক্ষেত্রে কার্যকর

বাণিজ্যিক নাম	বাতিলের কারণ
	নয়। এছাড়া গ্রাইপ ওয়াটারে এ্যালকালী বা এ্যালকোহল রয়েছে। অধিক সেবনে অ্যালকালী শরীরে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং কিডনীর ক্ষতি করে। এ্যালকোহলও শিশুদের জন্য ক্ষতিকর।
৯. শরীরের বাড়ন বৃদ্ধিকারক ওষুধ ; যেমন : এ্যানাপোলিন, ওরাবলিন, ডুরাবোলিন ইত্যাদি।	যত্রতত্র ব্যবহার করা হচ্ছে শরীরের বাড়ন বৃদ্ধি ও ওজন বাড়ানোর জন্য। এ-জাতীয় ওষুধ সেবনে জণ্ডিস ও লিভারের রোগ হতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে পুরুষালী লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া, লিঙ্গান্তর ইত্যাদি হতে পারে। প্রথম-দিকে কিছু শারীরিক বৃদ্ধি হলেও পরবর্তী পর্যায়ে শিশুদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

দ্বিতীয় তালিকায় বর্ণিত ওষুধসমূহে কোন-কোন উপাদান রয়েছে যেগুলি ক্ষতিকর বা অপ্রয়োজনীয়। এইসব উপাদান বাদ দিয়ে তৈরী করলে ওষুধগুলো বাজারজাত করার অনুমতি দেয়া যেতে পারে। এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কিছু ওষুধের নাম ও অন্তর্ভুক্তির কারণ দেয়া হল :

বাণিজ্যিক নাম	দ্বিতীয় তালিকাভুক্তির কারণ
১. এ্যান্টিবায়োটিক ও অন্য উপাদানের সংমিশ্রণ ; যেমন : ক্লোবামেক্স ফোর্ট, হেস্টাক্লোর এফ, অমনা-সিলিন, অমনাসিলিন ফোর্ট, রেস্টোক্লিন, টেরামাইসিন এস. এফ. ইত্যাদি।	এ্যান্টিবায়োটিকের সঙ্গে ভিটামিন ও অন্যান্য উপাদানের সংমিশ্রণের ফলে অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধি। এ্যান্টিবায়োটিকের সঙ্গে ভিটামিনের প্রয়োজন নেই। অতিরিক্ত উপাদানগুলো বাদ দিতে হবে।
২. একাধিক ভিটামিন অথবা ভিটামিন ও লিভার এক্সট্রাক্ট বা খনিজ পদার্থের সংমিশ্রণে প্রস্তুত ওষুধ সেবন ; যেমন : বেকোনেক্স, রুব্রাফেরেট, ফেরোনেট-বি, ফেমারোন, ফেরোফেনল, ভিটাপ্লেক্স,	অপ্রয়োজনীয়ভাবে একাধিক ভিটামিনের সংমিশ্রণ, ভিটামিন ও লিভার এক্সট্রাক্ট, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের সংমিশ্রণের ফলে অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধি। লিভার এক্সট্রাক্টের কোন প্রয়োজন নেই। কতগুলো ভিটামিন যেমন

বাণিজ্যিক নাম	দ্বিতীয় তালিকাভুক্তির কারণ
ভিটাপ্লেক্স ফোর্ট, পেনভিট, আয়-বোপ্লে…টি, বি-৫০ ফোর্ট, ফিডা-প্লেক্স, লিভেক্স ও বি-কমপ্লেক্সের সংমিশ্রণ, সাইট্রোভিট, বিকোটোন, ট্রাইএডিপ্লেক্স, ইত্যাদি।	বি-১২ আমাদের দেশে প্রয়োজন নেই, কারণ খাবারে এটা যথেষ্ট পাওয়া যায়। সব খনিজ পদার্থেরও প্রয়োজন নেই।
৩. এ্যালকোহল ও বেদনানাশক ওষুধের সংমিশ্রণ ; যেমন : টাইডিনল সিরাপ, প্যারাসিট পার এসপিরিন, পাইরিটোন এলিক্সির, প্যারাপেক্স, প্যারালজিন, জেরিন এলিক্সির প্যারাকল, পারনালজিন, প্যারামল লিকুইড ইত্যাদি।	অপ্রয়োজনীয় এ্যালকোহল বাদ দেওয়া যেতে পারে।
৪. একাধিক বেদনানাশক উপাদান ও অন্য উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তুত ওষুধ ; যেমন : এনাপাইরিন, এ. পি. সি. বায়োসপ্রিন, ডিসপ্রোট্যার পেরাপাইরিন, ইত্যাদি।	বেদনানাশক ওষুধসমূহের সংমিশ্রণে কার্যকারিতা বাড়ে না কিন্তু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সম্ভবনা বাড়ে। অন্যান্য উপাদান যেমন : ফেনোবার বিটোন একত্রে দেওয়া অনাবশ্যক।
৫. গ্লুকোজের সঙ্গে অন্যান্য পদার্থের সংমিশ্রণ ; যেমন : গ্ল্যাক্সোজ-ডি, গ্যাকোজ-ডি, এডিস গ্লুকোজ।	ভিটামিন-ডি ও ক্যালসিয়াম গ্লিসারো-ফসফেটের অনাবশ্যক সংমিশ্রণ ঘটিয়ে গ্লুকোজের মূল্য বৃদ্ধি।
৬. হাঁপানীর ওষুধের সঙ্গে অন্যান্য উপাদানের সংমিশ্রণে ; যেমন : এসমারিন এইচ, এসমাটোন।	হাঁপানীর কার্যকর ওষুধের সঙ্গে অন্যান্য অনাবশ্যক উপাদান ; যেমন : ক্যাফেইন, প্রমেফাজিন-এর সংমিশ্রণে মূল্য বৃদ্ধি।

তৃতীয় তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ওষুধসমূহ সীমিত সময়ের পর নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। নিম্নলিখিত কারণে এগুলো নিষিদ্ধ হচ্ছে :

ক. বিভিন্ন উপাদানসমূহের সংমিশ্রণে ওষুধ তৈরী করা হয়েছে অথবা উপাদান-সমূহের কোন কার্যকারিতা নেই বা সংমিশ্রণের ফলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সম্ভবনা বৃদ্ধি পেয়েছে।

খ. উপাদানসমূহের সামান্য রদবদলের পর কার্যকারিতায় কোন পরিবর্তন ছাড়া বিভিন্ন নামে ওষুধ বাজারে ছাড়া হয়েছে। এতে জনসাধারণ বিভ্রান্ত হচ্ছে। যে-প্রতিষ্ঠান বেশী প্রচার করতে পারে, তাদের ওষুধই বেশী বিক্রি হয়। এভাবে আসল

কার্যকর ওষুধের পরিবর্তে অকার্যকর ওষুধ বাজারে বিক্রি হয়। ফলে রোগের উপশম না হয়ে অনেক সময় জটিলতা বাড়ে।

গ. ওষুধ বা উপাদানসমূহ বাংলাদেশে যথেষ্ট পরিমাণে তৈরী হয় অথচ একই জিনিস আমদানী করা হচ্ছে। এতে বৈদেশিক মুদ্রা অপচয় ছাড়াও দেশীয় উৎপাদনকারীরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এবং রুগীদের অধিক মূল্য দিতে হচ্ছে।

ঘ. যে-সমস্ত ওষুধ দেশী প্রতিষ্ঠানসমূহ যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত করতে পারে যেমন: এ্যান্টাসিড, ভিটামিন সেগুলো বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে প্রস্তুত বন্ধ করা।

ঙ. অনেক বিদেশী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে কোন কারখানা ছাড়াই অন্যের কারখানায় পুঁজি বিনিয়োগ না করেই ওষুধ বানাচ্ছে এবং নিজেদের নামে বাজারজাত করছে। এতে দেশের স্বার্থ বিঘ্নিত হচ্ছে। এদেশে কারখানা বসানোর পরই কেবল এসব প্রতিষ্ঠানকে তাদের নামে ওষুধ বাজারজাত করার অনুমতি দেওয়া যায়। অন্যথায় যে প্রতিষ্ঠানে এসব ওষুধ তৈরী হয়, তারা তাদের নামে বাজারজাত করতে পারেন।

নিচে এই তালিকায় কিছু ওষুধের নাম ও তালিকাভুক্তির কারণ দেওয়া হল।

বাণিজ্যিক নাম	তৃতীয় তালিকাভুক্তির কারণ
১. করিবান, পেনিট্রায়াড, স্টেপটো-ট্রায়াড সালফাট্রায়াড, পেনটিডস, রুব্রাভিট, এ্যালডা সাইক্লিন ফোর্ট, অক্সালিন ফোর্ট, ফার্মাক্সিন ফোর্ট ক্যাপসুল, ডালএয়াল, এর্মপিক্লক্স, ফিমোটার ইউনিক্যাপ-এম ইত্যাদি।	অপ্রয়োজনীয় সংমিশ্রণ অনেক সময় ক্ষতিকর। অনাবশ্যক মিশ্রণের ফলে মূল্য বৃদ্ধি। মিশ্রণের ফলে কার্যকারিতা বাড়েনি।
২. ডলালজিন, টারবলান, বেসিরল, স্যালিসিটামল, নরজেসিক ইত্যাদি।	একাধিক উপাদান যোগ করার ফলে মূল্য বৃদ্ধি বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি।
৩. প্লেক্সামিন-বি, থেরাপ্লেক্স, ফাইডাপ্লেক্স, লাইসোভিট, লিভারপ্লেক্স, বেকোনেক্স, জেরভেড, অস্টোক্যালাসিয়াম, বেকাডেক্স, এডোক্সলিন, হেলিবোরেঞ্জ বি-ভিটামিন এলিক্সির, ফার্মাভিট, ভিটাপ্লেক্স ইত্যাদি।	অনেকগুলো ভিটামিনের অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয় মিশ্রণ। ভিটামিনের সঙ্গে খনিজ পদার্থ, গ্লিসারোফসফেট, হরমোনের মিশ্রণ। তরল আকারে ভিটামিন মিশ্রণের ফলে অপচয়।

বাণিজ্যিক নাম	তৃতীয় তালিকাভুক্তির কারণ
৪. মেথিপ্লেক্স, পেপসিডিন ভি, ফার্মাজাইম, নিওরোভিট, সুপারজাইম, ইউনিজাইম, লিভাপ্লেক্স ইত্যাদি।	কার্যকারিতার কোন প্রমাণ নেই। টনিক স্বাস্থ্যবর্ধক, হজমীবর্ধক ইত্যাদি নামে জনগণের অজ্ঞতার সুযোগ অবাধে বিক্রি হয়।
৫. কোরেক্স, ডাইমাইরিল, পিরিটোন জি লিঙ্কটাস, পিরিটোন এক্সপেক্টোরেন্ট, ডেকোয়াডিন, ফেনসিডিল, ভ্যালেক্স, সায়োএ্যালকালী, এ্যালকাসিড, সাইট্রোল, টুসকা, টুসিকফ, পেপস, স্ট্রেপসিলস ইত্যাদি।	অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর উপাদান মিশিয়ে কফ সিরাপ, থ্রোটলজেন্স, ব্লাড এ্যালকালাইজার, গ্রাইপ ওয়াটার ইত্যাদি নামে চালানো হচ্ছে। কার্যকারিতার কোন গ্রহণযোগ্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই।
৬. ডুরাবলিন, ডেকা ডুরাবলিন, অরাবলিন, সাসটানোন, ডেকাডিন, ডেকাবলিন, ইত্যাদি।	উপাদানসমূহের সামান্য পার্থক্য অথচ বিভিন্ন নামে বজারে প্রচলিত আছে এবং বিক্রি হচ্ছে। কার্যকারিতা সন্দেহজনক বা নগণ্য এবং অপব্যবহার প্রচুর।
৭. ডুয়ামিন-এস, বিসমোজিম, স্টমাক কিউর, স্টমাকিন, ওয়াটারবেরীস কম্পাউন্ড, মরিয়ামীন এম-২ ও ডি-২, সিরাপ হেমোগ্লোবিন, বেলাডিনাল, রেডিসল, লিব্রাক্স, কাইমার ইত্যাদি।	অপ্রয়োজনীয়, ক্ষতিকারক এবং প্রতারণামূলক নাম।
৮. সিরাপ বাসক, গ্যাকোফেক্স, বিসমাথ এটএ্যামোন সাইট্রেট, টিংচার ক্যাম্ফর, রাউন্ড পিল, বিসমোজিম, লিভারজিন, লিংকটাস একোনাইট ইত্যাদি।	আধুনিকতম ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়া বা ফার্মাসিউটিক্যাল কোডেক্সে অন্তর্ভুক্ত নয়। কার্যকারিতার জোরালো প্রমাণ নেই।
৯. সেমিকো, মিউকেইন, এ্যাসমার, অক্সাসিলিন, ব্যাকট্রিন, ক্লোরোমাইসিটিন, ইনসিডাল, এমোক্সিল, পলিবাইওন, সেবিয়ন ইত্যাদি।	যথেষ্ট দেশীয় উৎপাদন থাকায় বিদেশ থেকে আমদানীর প্রয়োজন নেই।
১০. লিডারমাইসিন, অমনিপেন, পেনব্রিটিন, সেপট্রিন ইত্যাদি।	বিদেশী স্বত্বাধীন নামে তৈরী হবার জন্য অত্যধিক মূল্য দিতে হয় অথচ সমমানের ওষুধ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের রয়েছে।

অত্যাবশ্যকীয় ১৫০টি ওষুধের তালিকা

অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকায় কিছু সংখ্যক দেশী কোম্পানীর ওষুধের নাম দেয়া হল। যে সমস্ত ওষুধের পাশে বাণিজ্যিক নাম দেওয়া হয়নি সেগুলো হয় বহুজাতিক কোম্পানী কর্তৃক দেশে প্রস্তুত হয় অথবা বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়।

বৈজ্ঞানিক নাম	বাণিজ্যিক নাম
১. এস্পিরিন	জি-এস্পিরিন, এস্পিরিন, এসিপিন, ফার্মাপাইরিন
২. ক্লোরোকুইন ফস্ফেট	ফার্মাকুইন, এলডাকুইন
৩. এলুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড	থেরাসিড, এণ্টাসিড, এলডাসিড, জি-এণ্টাসিড, এপাজেল, এলিউসিল, এড্রিসিডোনা
৪. পাইপেরাজিন	হেলমিপার, জি-পাইপেরাজিন, এসকাপার, এড্রুজিন, ভারমেক্স, ওয়ার্মপেল
৫. গ্লুকোজ ইলেক্ট্রোলাইট পাউডার (ও. আর. এস)	ওরালাইট-ডি, লবণ জলের সরবত
৬. ফেনক্সিমিথাইল পেনিসিলিন	পেনভিক্, অপসোসিলিন, টাইপেন, সাইটাপেন-ভি
৭. এম্পিসিলিন	সেমিসিলিন, এমপিসিন,,এমপ্লিন, থেরাসিলিন, এমপিসিল, এমপেক্সিন, এডিসিলিন, জি-এমপিসিলিন, ফার্মাসিলিন, এলডাপেন, ফাইসিলিন, সিমাসিলিন
৮. আর্গোমেট্রিন/মিথাইল আর্গোমেট্রিন ম্যালেট ট্যাবলেট	ইরেজিন, মেথাড্রিল
৯, ফেরাস সালফেট	থেরাফিওন, মে-ফ্লাওয়ার, জি-আয়রন ফলিক এসিড, ফেরোমল্ট, ফেরেট
১০. এফেড্রিন	এফেড্রিন হাইড্রোক্লোরাইড, এফেড্রিন
১১. ভিটামিন এ	ভিটামিন এ
১২. ক্লোরামফেনিকল/আই/ইয়ার ড্রপ/অয়েণ্টমেণ্ট/	এড্রুমাইসিটিন

বৈজ্ঞানিক নাম	বাণিজ্যিক নাম
১৩. প্যারাসিটামল	সিটামল, প্যারাসিটামল, টাইডেনল, জি-প্যারাসিটামল, প্যারামিলন, প্যারাডল, প্যারাসিটল, প্যারাটেম, ফিটামল, প্যারামল
১৪. পেথিডিন হাইড্রোক্লোরাইড	পেথিডিন হাইড্রোক্লোরাইড, পেথিডিন
১৫. সালফাডক্সিন ও পাইরিমেথামিন	মেলাসির
১৬. লেভামিসল	ভারমিকম্, ডেকারিস্, লেভানক্স, এলকারিস, লেভামিন, লেমোসল, লিভোসল
১৭. ক্লোরফেনিরামিন	ইরামিন, হিস্টাল, হিস্ট্রল, এনটিসটা
১৮. লিডোকেইন ১%	
১৯. আইসোনিয়াজাইড ও থায়াসিটাজোন	টিবিসাইর, থয়োজির
২০. স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট	স্ট্রেপ্টোমাইসিন
২১. মেট্রোনিডাজোল	মেট্রিল, এমোডিস, ক্লিওন, মেট্রোজোল, এমেরিল, ট্রাইকোজাইল, ট্রায়ন, জি-মেট্রোনিডাজোল, ফাইডাজোল, মেটাজোল, মেট্রোনির, সিমাজিল
২২. এট্রোপিন সালফেট	এট্রোপিন, এট্রোপিন সালফেট
২৩. হায়োস্সিন-এন-বিউটাইল ব্রোমাইড	হাইসোমাইড, স্পাজমোস্ট্যাট, স্পাজিন স্পাল্জিন, হাইসোপেইন, বুটাপেন
২৪. ক্লোরহেক্সিডিন/ক্লোরঅক্সিলিন	জারমল
২৫. প্রোকেন পেনিসিলিন	
২৬. টেট্রাসাইক্লিন/অক্সিটেট্রাসাইক্লিন	জি-টেট্রাসাইক্লিন, এলডাসাইক্লিন, টেরাসিন, এসকিউ-সাইক্লিন, অক্সালিন এন্ড্রুসাইক্লিন, ডক্সিন, টেট্রান-বি, নিউট্রাসাইক্লিন, টেট্রাসাইক্লিন
২৭. ফেনোবারবিটোন	ফেনোবারবিটোন, ফেনোবারবিটেল
২৮. ডায়াজেপাম	ইসিয়াম, থেরাপাম, জি-ডায়াজেপাম, সেডিল, সেডিটিল, ফায়াজিপাম, সেডাক্সেন, ফার্মাপাম, ডায়জেপ
২৯. ক্লোরপ্রোমাজিন	
৩০. আই ভি সেলাইন (ডেক্সট্রোজ এর সহিত বিভিন্ন মানের সেলাইন/ডেক্সট্রোজ ছাড়া কেবলমাত্র ০.৯% সেলাইন)	আই. ভি. ফ্লুইড, ডেক্সট্রোজ ৫%

বৈজ্ঞানিক নাম	বাণিজ্যিক নাম
৩১. ডেক্সট্রোজ ইন ওয়াটার (৫%, ২৫%, ৫০%)	
৩২. রিডিস্টিল্ড্ ওয়াটার	ওয়াটার ফর ইনজেকশন, রি-ডিস্টিল্ড্ ওয়াটার
৩৩. কলেরা ফ্লুইড	
৩৪. অক্সিটোসিন	অক্সিটন, অক্সিটোসিন
৩৫. ফ্রুসেমাইড	জি-ফ্রুসেমাইড, ফিউসিড, ট্রিফিউরিট্, ফ্রুসিন
৩৬. প্রেডনিসোলন	ফার্মাসোলন, প্রেডনিসোলন
৩৭. প্রোপ্রানলল	প্রোপানল, প্রোপ্রানলল
৩৮. এমাইনোফাইলিন	এমাইনোফাইলিন
৩৯. কো-ট্রাইমোক্সাজোল	কোট্রিম, জি-কোট্রাইমোক্সাজোল, প্রাইমাজোল, থেরাট্রিম, কেমোট্রিম, কেমোজোল, সুমেট্রোলিম, সেপ্টাজোল, ফার্মাট্রিম, মেথোপ্রিম. সিমাট্রিম
৪০. হেমোট্রোপিন	
৪১. ডি টি/ডি পি টি/টিটানল	ডিপ্থেরিয়া-পারটুসিস্-টিটেনাস ভ্যাক্সিন
৪২. ডিপ্থেরিয়া এণ্টিটক্সিন	
৪৩, ভিটামিন বি কমপ্লেক্স	ভাইটিন, ভিটামিন বি কমপ্লেক্স, মিনিভিট, থেরাপেক্স, এড্রুভিট. ফার্মাভিট, বি ৫০, ভিটাপেক্স. সিমাপ্লেক্স
৪৪. স্যালিসাইলিক এসিড ও বেন্জোইক এসিড এর মলম	বেনসালিফ
৪৫, বেন্জাইল বেন্জোয়েট	এস. বায়ল
৪৬. ইণ্ডোমেথাসিন	ইনডোমেট, মেথাসিল, রিউমিন, এনডোরিন, ইনডোমেথাসিন, রিউমাসিন, রিউমেট
৪৭. মরফিন সালফেট	মরফিন সালফেট
৪৮. এলোপিউরিনল	মাইলিউরিট, পিউরিনল
৪৯. কুইনিন	ফার্মাকুইন, কেডিকুইন, সিমাকুইন, সায়োকুইন

বৈজ্ঞানিক নাম	বাণিজ্যিক নাম
৫০ কর্টিকোস্টেরয়েড আই ড্রপ/অয়েণ্টমেণ্ট	
৫১. ডাই-ইথাইল-কার্বামাজিন	লক্সুরান, কার্বানিন
৫২. ক্লোরামফেনিকল স্কিন অয়েণ্টমেণ্ট	
৫৩. মেবেনডাজল	ভারমক্স, মাইজল, আরমক্স, ক্রেমক্স, সোলাস, মিনিক্স, মেবানট্রিন, অ্যালডামক্স
৫৪. প্রোমথাজিন	হিস্টারজিন, প্রোমেস্টিন, ফ্লুফেন
৫৫. ইথার এনেসথেটিক	
৫৬. প্রোকেইন হাইড্রোক্লোরাইড	
৫৭. সক্সামেথোনিয়াম	
৫৮. থায়োপেণ্টোন সোডিয়াম	
৫৯. গ্যালামিন-ট্রাই-এথিডাইড	
৬০. টিউবোকিউরারিন	
৬১. হ্যালোথেন	
৬২. আইসোনিয়াজাইড	আইসোনিসিড, আই. এন. এইচ, আইসোনিয়াজাইড
৬৩. ইথামবিউটল	সুরাল, মাইকোব্যাক, ফায়ামবুটাল, এসবুটাল, ইথামবিন
৬৪. রিফামপিসিন	রিফাসিন, রিফসিন, রিফানিন, রিফামপিসিন, ইফাসিন, ফাইরিপাম
৬৫. ড্যাপসোন	সোনাম
৬৬. গ্লাইবেনক্লামাইড	ডাইবেনল, ডায়াবিন, গ্লুকো, গ্লুকন
৬৭. ইনসুলিন	
৬৮. পাইলোকাপিন ড্রপ (১%, ২%, ৪%)	
৬৯. ইমেটিন হাইড্রোক্লোরাইড	
৭০. ন্যালোক্সোন হাইড্রোক্লোরাইড	
৭১. সোডিয়াম থায়োসালফেট	
৭২. ট্রাইফ্লুপেরাজিন	ট্রাইডিল
৭৩. প্রালিডক্সিম	
৭৪. সোডিয়াম এণ্টিমোনি গ্লুকোনেট	
৭৫. টিংকচার আয়োডিন	
৭৬. লাইসল/ক্রেসল/সোপ সল্যুসান	
৭৭. বেঞ্জাইল পেনিসিলিন	

বৈজ্ঞানিক নাম	বাণিজ্যিক নাম
৭৮. বেঞ্জাথিন পেনিসিলিন	
৭৯. ইরিথ্রোমাইসিন	ইরোসিন, এরোমাইসিন
৮০. জেণ্টামাইসিন	জেনটিম
৮১. ক্লক্সাসিলিন	লক্সাসিন, ক্লক্সিন, ক্লক্সলিন, ক্লক্সাসিন
৮২. ইথোসাক্সিমাইড	
৮৩. ফেনিটইন	ডাইফেড্যান
৮৪. এমিট্রিপ্‌টিলিন/নরট্রিপ্‌টিলিন	এমিট্রিপ্‌টিলিন হাইড্রোক্লোরাইড
৮৫. হ্যালোপেরিডল	হ্যালডল, পেরিডল
৮৬. প্রোক্লোরপেরাজিন	ভার্গন
৮৭. পটাশিয়াম ক্লোরাইড	
৮৮. ম্যানিটল সল্যুশান	
৮৯. ডায়ালাইসিস্ ফ্লুইড	
৯০. প্লাসমা সাবস্টিটিউট	
৯১. সোডি-বাই-কার্ব ইনফিউশ্যান (৭.৫%, ৮.৪%)	
৯২. বেনড্রোফ্লুয়াজাইড	
৯৩. এসিটাজোলামাইড	
৯৪. স্পাইরোনোল্যাক্টোন	ভেরোস্পাইরন, স্পাইরন, পাইলেকটন
৯৫. বেরিয়াম সালফেট	
৯৬. আইয়োডোপামাইড (৩০%,)	
৯৭. আয়োপানোইক এসিড/ আয়োবেনজামিক এসিড	টেলিপেক
৯৮. এসেট্রিজোইক এসিড/ আয়োডাইজড ওয়েল	
৯৯. সোডিয়াম ডায়াট্রোজোয়েট	
১০০. আয়রন-ডেক্সট্রান কমপ্লেক্স	ইমফেরন
১০১. ফলিক এসিড	জি-আয়রন-ফলিক এসিড, ফেরোফল, ফলিক এসিড
১০২. হাইড্রোকরটিসোন	
১০৩. ডেক্সামেথাসোন	ডেকাসন, হেক্সাডরন, ডেক্সাসন
১০৪. স্টিলবেস্ট্রল/ডাই-ইথাইল স্টিলবেস্ট্রল	স্টিলবেস্ট্রল
১০৫. লেভো-থাইরক্সিন	
১০৬. প্রোজেস্টেরন প্রিপারেশনস	

বৈজ্ঞানিক নাম	বাণিজ্যিক নাম
১০৭. নিওমার্কাজোল	
১০৮. ডিগক্সিন	ডিগক্সিন
১০৯. ডায়াজক্সাইড	
১১০. মিথাইলডোপা	ডোপেজিট, ফাইডোপা, ডোপামিন
১১১. গ্লিসারাইল ট্রাইনাইট্রেট	
১১২. প্রোকেইনামাইড	
১১৩. হেপারিন	হেপারিন
১১৪. ওয়ারফারিন সোডিয়াম	
১১৫. টেট্রাকেইন/নভোসিন	
১১৬. মেটারামিনল	
১১৭. সেনা	
১১৮. গ্লিসারিন সাপোজিটরি	গ্লিসারিন সাপোজিটরি
১১৯. সালফাডাইমাইডিন	সালফাডাইমাইডিন
১২০. আইব্রোপ্রফেন	ব্রুফেন, আইরুফেন, প্রোফেন, আইবুফেন
১২১. সালফানিলামাইড পাউডার	
১২২. সালফাডায়াজিন	সালফাডায়াজিন
১২৩. অ্যাড্রেনালিন/এপিনেফ্রিন	অ্যাডরেনালিন
১২৪. নিওস্টিগ্মিন	
১২৫. সালবুটামল	ব্রঙ্কল, সুলটালিন, সালবুটল, এজমালিন, সালটালিন
১২৬. এ. সি. ডি. ব্লাড প্যাক	
১২৭. টি এ বি সি	
১২৮. এণ্টি র‍্যাবিস ভ্যাক্সিন	
১২৯. পলি ভ্যালেণ্ট এণ্টি ভেনম	
১৩০. টিটেনাস এণ্টি টক্সিন	টিটেনাস এণ্টি টক্সিন
১৩১. আর্গোমেট্রিন/মিথাইল আর্গোমেট্রিন ম্যালেট ইঞ্জেকশন	মেথার্জিন, ইরেজিন
১৩২. ভিটামিন বি১	নিওরিন, বি১, থাইওভিট্, মনোমিন
১৩৩. ভিটামিন সি	স্করমিন, থেরাকন, সিভিট, ওভিট-সি, এসকোভিট, ভাইটিন-সি, সাইট্রোভিট
১৩৪. ভিটামিন বি^{12}	ভিটামিন বি^{12}, সাইনোভিট
১৩৫. ভিটামিন কে	

বৈজ্ঞানিক নাম	বাণিজ্যিক নাম
১৩৬. সাইক্লোফসফামাইড	
১৩৭. ৫-ফ্লুরোইউরাসিল	
১৩৮. মেথোট্রেক্সেট	
১৩৯. বিউসালফ্যান	
১৪০. ভিন্‌ক্রিস্টিন্	ভিন্‌ক্রিস্টিন
১৪১. নাইট্রোজেন মাস্টার্ড	
১৪২. ড্যানোরুবিসিন	
১৪৩. ক্লোরামবিউসিল	
১৪৪. ফ্লুরেসিন আই ড্রপ	
১৪৫. ক্লোফাজিমিন	
১৪৬. ক্যালসিফেরল	
১৪৭. গ্রাইসিওফাল্‌ভিন	ফুলভিন, রাইসোভিন, গ্রাইসোনিন
১৪৮. পাইরাজিনামাইড	টুবরানিন
১৪৯. প্লাস্টার অফ প্যারিস	
১৫০. জিঙ্ক-অক্সাইড এডহেসিভ ব্যাণ্ডেজ	

তালিকার প্রথম ১২টি ওষুধ গ্রাম পর্যায়ের স্বাস্থ্য কর্মীরা ব্যবহার করতে পারবেন। প্রথম ৪৫টি ওষুধ থানা পর্যায়ে ব্যবহার করা যাবে। তালিকার সবগুলি ওষুধ তৃতীয় (মেডিকেল কলেজ/জেলা হাসপাতাল) পর্যায়ে ব্যবহৃত হবে।

অত্যাবশ্যকীয় ১৫০টি ওষুধ ছাড়াও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে ব্যবহারের জন্য অতিরিক্ত ১০০টি ওষুধ নির্ধারিত করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য না ধূমপান—এর কোনটি চান

আসছে ৭ই এপ্রিল ১৯৮০ বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস। এবার ঐ দিনের শ্লোগান হচ্ছে 'Smoking or Health : The Choice is yours' স্বাস্থ্য না ধূমপান এর কোনটি চান? অর্থাৎ আপনি ধূমপান বেছে নিলে আপনার স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে পারবেন না আবার সুস্বাস্থ্য চাইলে ধূমপান করতে পারবেন না।

বাংলাদেশে এবং অন্যান্য অনেক দেশে ধূমপানের অপকারিতা সম্বন্ধে অনেক বলা বা লেখা হয়েছে কিন্তু এর অভ্যাস দিন দিন বেড়েই চলেছে, আর বাড়ছে ধূমপানের ফল হিসেবে দুরারোগ্য ব্যাধি। সম্ভবত ধূমপান যে কত ক্ষতিকারক এটা অবহিত করার জন্যই বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের এবারের শ্লোগান সুস্বাস্থ্য বা ধূমপান, আপনার পছন্দসই যে কোন একটি গ্রহণ করুন।

মেডিকেল ডাইজেস্ট-এর যাত্রালগ্নে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের শ্লোগানের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে ধূমপানের অপকারিতা, উপকারিতা ইত্যাদির উপর এই বিশেষ নিবেদন—স্নাতোকোত্তর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের পরিচালক অধ্যাপক নুরুল ইসলামের সাথে একটি সাক্ষাৎকার।

মেডিকেল ডাইজেস্ট ঃ ধূমপান কখন, কোথায় এবং কিভাবে শুরু হয়?

অধ্যাপক নুরুল ইসলাম ঃ এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা ১৯৭৮ (Encyclopedia Britanika, 1978) অনুসারে ক্রিসটোফার কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কারের পর দেখতে পান যে সেখানকার অধিবাসীরা আজকালকার মত ধূমপানে অভ্যস্ত। আমেরিকান ইণ্ডিয়ানরা বিশ্বাস করতো ধূমপানে ঔষধের মত উপকারিতা আছে এবং এই ধারণাবসেই ইউরোপে ধূমপানের সূচনা হয়। রেড ইণ্ডিয়ানদের কাছে ধূমপান ছিল একটি শান্তিনল (peace pipe)। উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা তামাকের চাষ করতো। ইউরোপে ধূমপানের অভ্যাস ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে এটা সারা বিশ্বে বিস্তৃতি লাভ করে। প্রথম ধূমপান শুরু হয় ফ্রান্সে ১৫৫৬ সালে, পর্তুগালে ১৫৫৮ সালে, স্পেনে ১৫৫৯ সালে এবং ইংল্যাণ্ডে ১৫৬৫ সালে। পর্তুগালে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত (ambassador) জিন নিকোটের সম্মানার্থে নিকোটিন শব্দের উৎপত্তি, কারণ তিনিই নাকি ফ্রান্সের রানী ক্যাথরিন ডি মেডিকাসকে তামাকের বীজ উপহার দেন।

পর্তুগীজ এবং স্পেনীয় নাবিকরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তামাক নিয়ে যায় এবং ধূমপানের অভ্যাস বিস্তারে সাহায্য করে।

মোটামুটিভাবে এটাই ধূমপানের গোড়ার কথা। তবে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পূর্বে কিভাবে এবং আরও কত আগে সেখানে ধূমপানের অভ্যাসের সূত্রপাত হয়েছিল সেটা আমাদের জানা নেই।

বাংলাদেশে ধূমপানের সূত্রপাত হয় সম্ভবত্ত পর্তুগীজ আমলে যখন চট্টগ্রাম বন্দরে তাদের আনাগোনা ছিল অনেক।

মে. ডা. ধূমপানের ফলে কি ক্ষতি হয় বা কি কি রোগ হয়?

নু. ই. ধূমপানের ফলে মানুষের শরীরে ক্ষতির পরিমাণ সাধারণের ধ্যান ধারণার অনেক বাইরে। ধূমপান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে এর ক্ষতির পরিমাণ যদি জানা থাকতো তাহলে এর বদভ্যাস মানব সমাজে এতটুকু প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারতো কিনা সন্দেহ। ধূমপানের ফলে আপাদমস্তক মানবদেহের প্রতিটি অঙ্গে কুফল দেখা দিতে পারে।

ফুসফুস (lung)-এ ধূমপানের ক্ষতির পরিমাণ সর্বাধিক। ফুসফুসের ক্যান্সারের প্রথম এবং প্রধান কারণ ধূমপান। এই অভ্যাসের প্রথম বিস্তৃতির সাথে সাথে ফুসফুস ক্যান্সার (lung cancer) এর সন্দেহাতীত সম্পর্ক রয়েছে। দেখা গেছে ধূমপানের হার বাড়ার সাথে সাথে ফুসফুস ক্যান্সারের হার বেড়ে যায়। বৃটেনে একটি জরীপে দেখা গেছে যে সেখানে ধূমপানের অভ্যাস কমে যাবার সাথে সাথে সেখানে ফুসফুস ক্যান্সার এর প্রকোপও কমে গিয়েছিল। অন্যদিকে দেখা গেছে মেয়েদের ধূমপানে আসক্তি বাড়ার সাথে সাথে তাদের ফুসফুসে ক্যান্সারের হার বেড়ে গেছে। আমাদের দেশের মেয়েদের ধূমপানের অভ্যাস বেড়ে যাচ্ছে—এটা নিঃসন্দেহে বিপদজনক।

শ্বাসকষ্ট বা ক্রনিক ব্রংকাইটিস্ (Chronic bronchitis) এর উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে ধূমপান। শ্বাসকষ্ট হলে পর ধূমপান বন্ধ করলে কয়েকদিনের মধ্যেই এর উপকারিতা অনুভব করা যায়।

ধূমপানের ফলে মস্তিষ্কের শিরা-উপশিরায় পরিবর্তনের ফলে রক্তক্ষরণ হতে পারে (Subarachnoid haemorrhage)। জাপানে একটি সমীক্ষার মাধ্যমে দেখা গেছে যে, এ রোগ ধূমপায়ীদের মধ্যে নিঃসন্দেহে বেশী পরিমাণ দেখা যায়।

শিরা-উপশিরার ক্ষতিসাধন শুধু মস্তিষ্কেই সীমাবদ্ধ নয়, হৃদপিণ্ডের রক্তসঞ্চালনকারী ধমনীর (coronary artery) পরিধি এবং প্রসারণ ক্ষমতা কমে যাওয়ার ফলে হৃদপিণ্ডে প্রয়োজনীয় রক্তসঞ্চালন বাধাপ্রাপ্ত হয়, কিংবা এ সমস্ত পরিবর্তনের ফলে ধমনীর ভেতর রক্ত জমাট বাধলে মায়োকার্ডিয়েল ইনফার্কশন (Myocardial Infarction) বা সচরাচর আমরা যাকে করোনারী থ্রম্বোসিস বলে থাকি সেটা হতে পারে। এটা নিঃসন্দেহে একটা সাংঘাতিক ব্যাধি।

একইভাবে শিরা-উপশিরার পরিবর্তনের ফলে পায়ে রক্ত সঞ্চালন বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ব্যথা অনুভূত হয় এবং চলাফেরার অক্ষমতা হতে পারে, এমন কি, পরিণামে ক্ষত (gangrene) হয়ে বিশেষ করে পায়ের আঙ্গুল পচে যেতে পারে।

ধূমপান দৃষ্টিশক্তিরও ক্ষতিসাধন করতে পারে।

মে. ডা. সিগারেটের মধ্যে কি থাকে যার ফলে এটা মানুষের বিভিন্ন রোগ বিস্তারের সহায়তা করে?

নু. ই. সিগারেটে বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত পদার্থ থাকে যেগুলো ক্যান্সার সৃষ্টির কারণ কিংবা সহায়ক হতে পারে, তাদেরকে বলা হয় কারসিনোজেনস্ (Carcinogens)। পলিসাইক্লিক হাইড্রোকার্বন (Polycylic hydrocarbons) এগুলোর মধ্যে প্রধান। এগুলো ছাড়া নাইট্রোসামাইন (Nitrosamine) এবং বিটা ন্যাপথোলামাইনস (Naphtholamines) সামান্য পরিমাণে থাকে। বাকী বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত উপাদানের মধ্যে এক্রোলিন (Acrolein), নাইট্রিক অক্সাইড (Nitric Oxide) এবং নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড (Nitrogen dioxide) উল্লেখযোগ্য।

মে. ডা. দিনে মাত্র ৪/৫টি সিগারেট খেলে কি সুস্থ লোকের কোন ক্ষতি করে?

নু. ই. মোটামুটিভাবে দেখা গেছে, দৈনিক ২০টা কিংবা তার চেয়ে বেশি সিগারেট খেলে মানুষের শরীরে বিভিন্ন রকমের অপকারিতা দেখা দেয়। দৈনিক ৪/৫ টা সিগারেট ক্ষতিকর বলে এখনও প্রমাণিত হয়নি। ব্যক্তিগতভাবে তবু আমি দৈনিক ২/৩টা সিগারেটকেও ক্ষতিকর বলে মনে করি। ধূমপান এমন একটি অভ্যাস যা শুরু হয় বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া ২-১টা 'টান' দিয়ে। তারপর ১টা থেকে ২টা, ২টা থেকে ৩টা, এমনি করে বাড়তে থাকে। আরও একটি মজার কথা হল এ অভ্যাস প্রথমে ধার করে চলে, মোটামুটিভাবে বন্ধুবান্ধব থেকে চেয়ে নেয়া কয়েকটি সিগারেটে সীমাবদ্ধ থাকে, পরবর্তীতে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন ধূমপায়ীরা অন্য কোন বিশেষ উপকারী জিনিস বাদ দিয়ে হলেও সিগারেট কিনতে বাধ্য হয়।

মে. ডা. প্রায়ই শোনা যায় একটি সিগারেট মানুষের আয়ু কয়েক সেকেন্ড কমিয়ে দেয়, এ ব্যাপারে কিছু বলুন।

নু. ই. একটি সিগারেট মানুষের আয়ু কয়েক সেকেন্ড কমিয়ে দেয় কথাটা অনেকাংশে সত্যি, কারণ দেখা গেছে ধূমপায়ীদের মধ্যে মৃত্যুর হার যারা ধূমপান করেন না তাদের চেয়ে শতকরা ৩০ থেকে ৯০ ভাগ বেশী। এদের মধ্যে যারা অল্প বয়সে ধূমপান আরম্ভ করে তাদের ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশী। ধূমপানের ক্ষতির পরিমাণ সিগারেটের পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

মে. ডা. একটি ফিল্টার টিপড্ সিগারেট, একটি সাধারণ সিগারেট এবং ১টি সিগারের মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কোন পার্থক্য আছে কি?

নু. ই. ফিল্টার টিপ্‌ড্‌ সিগারেট এবং ১টি সাধারণ সিগারেট দুটোই ক্ষতি-কারক। 'সিগার' তুলনামূলকভাবে সিগারেটের চেয়ে কম ক্ষতিকারক হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যারা 'সিগার' খায়, অনেক সময় ব্যক্তিগত সুবিধার্থে কিংবা অন্যান্য কারণে সিগারেটও ব্যবহার করে থাকে, যেহেতু ধূমপানের অভ্যাস একটা বিশেষ ধরনের সিগারেট কিংবা পাইপে সীমাবদ্ধ থাকে না, ধূমপান মাত্রই ক্ষতিকারক বলে ধরে নেওয়া যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করি।

মে. ডা. সিগারেট, বিড়ি, হুক্কা-এর মধ্যে কোনটির ক্ষতির পরিমাণ সবচেয়ে বেশী এবং কোনটির সবচেয়ে কম ও কেন?

নু. ই. আগের প্রশ্নে এর জবাব অনেকটা দেওয়া হয়েছে। বিড়িতে নিকোটিনের পরিমাণ এবং অন্যান্য বিষাক্ত জিনিসের পরিমাণ বেশি বলে এটা নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকারক। হুক্কা ব্যবহারে ক্ষতির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম, কারণ প্রথমত হুক্কার ধুয়া কলকি থেকে ব্যবহারকালে মুখ পর্যন্ত অনেক দূরত্বের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে কিছুটা পরিশোধিত হয়। বিশেষ করে হুক্কার নল এবং জল পরীক্ষা করলে দেখা যায় অনেক জমাট বিষাক্ত জিনিস তাতে আটকা পড়েছে। তবে যদি এ জল দিনে ২/৩ বার করে বদলানো না হয় (যেটা সাধারণত করা হয় না) এবং নল পরিষ্কার করা না হয় (সেটাও সাধারণত করা হয় না) তবে এগুলোর বিষাক্ত জিনিস ধারণ ক্ষমতা আর থাকে না। ফলে হুক্কায় ধূমপান যতটুকু বিপদমুক্ত হওয়া উচিত ছিল তা হয় না। নিরাপদ মনে করে এতে আসক্তি জন্মালে যা ক্ষতি তাতো হবেই।

মে. ডা. আমাদের দেশে এবং বিশ্বের বেশির ভাগ দেশেই পুরুষরা তুলনা-মূলকভাবে মেয়েদের চাইতে বেশি ধূমপান করে, এর কারণ কি?

নু. ই. কথাটা ঠিক, তবে কারণ সম্পূর্ণ জানা আছে বলে মনে হয় না। ধূমপান কোন কারণে আমাদের দেশে গুরুজনদের সামনে করা হয় না, এটাকে একটা বেয়াদবী বলে গণ্য করা হয়। আমাদের দেশের মেয়েরা সাধারণত পুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাছাড়া যেহেতু এটি একটি খারাপ অভ্যাস বলে প্রচলিত এবং মেয়েদের মধ্যে এর বিস্তৃতি নেই, সেজন্য যারা নিজেদেরকে তথাকথিত 'আল্ট্রামডার্ন' বলে পরিচয় দিতে চান না, ধূমপান তাদের কাছে সামাজিক দৃষ্টিতে একটি নিন্দিত অভ্যাস।

মে. ডা. সিগারেট, বিড়ি ইত্যাদির পরিবর্তে এমন কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে কি যা ধূমপানের অভ্যাসকে স্থানান্তরিত করতে পারে কিন্তু ধূমপানের মত ক্ষতিকর নয়?

নু. ই. বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মহল থেকে দাবী করা হয়েছে নিকোটিন ফ্রি সিগারেট, নিরাপদ ধূমপান ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে কোনটা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আমি মনে করি এগুলো ব্যবসা প্রসারের বিভিন্ন ধরনের কারসাজি, যাকে ধাপ্পাও বলা যায়।

মে. ডা. ধূমপানের ফলে ক্ষতি হয় সত্যি, কিন্তু এতে মানুষের কোন উপকার হয় কি?

নু. ই. শুনেছি বাসে কিংবা ট্রামে বসে একটা সিগারেট অফার করে ধূমপায়ী

বিদেশী মহিলাদের সাথে আলাপ জমানো যায়, এটা উপকার কিনা জানিনা তবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ধূমপানে কোন উপকার হয় কিনা আমার জানা নেই এবং হয় বলে বিশ্বাসও করি না।

মে ডা. উন্নত দেশের সিগারেট প্যাকেটে লেখা থাকে 'ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর'। কিন্তু আমাদের দেশের সিগারেট প্যাকেটে লেখা থাকে না, এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?

নু. ই. "ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর" এ ধরনের কিছু লেখা থাকলে জনসাধারণ অন্তত ধূমপান করার সময় বুঝতেন—এটা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর তবুও আমি করছি, এতে করে তাদেরকে ধূমপানের অপকারিতা বোঝানো সহজ, কিন্তু আমাদের দেশে এটা লেখা তো থাকেই না, এমন কি, এ ধরনের কোন আইনও প্রণয়ন করা হয়নি কেন সেটাও আমার বোধগম্য নয়।

এমন একটা নির্ভেজাল সত্যকে কতদিন আমাদের ধামাচাপা দিয়ে রাখা উচিত সেটার বিচার পাঠকরাই করুন। আমার মতে সিগারেট প্যাকেটে 'ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক' এটা লেখা থাকলেও চলবে না, বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের জনসাধারণকে ধূমপানের অপকারিতা বুঝাবার জন্য এগিয়ে আসা উচিত। আমি মনে করি এটা আমাদের নৈতিক এবং সামাজিক দায়িত্ব।